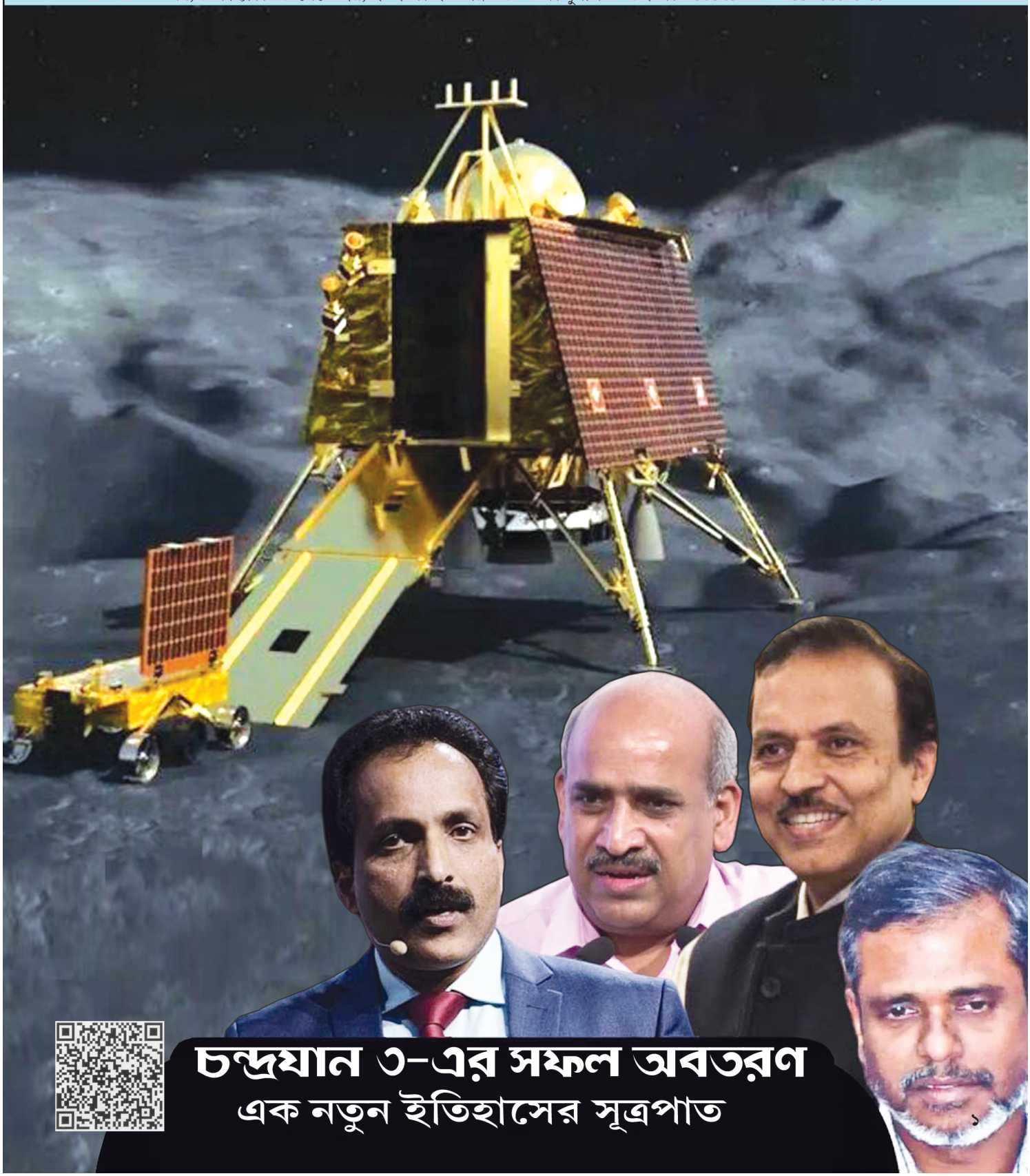
দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

চন্দ্রপৃষ্ঠে বিক্রমের সফল অবতরণ ভারতীয় বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্বই প্রমাণ করে— পৃঃ ২৩

মোদীর শাসনকালে বিজ্ঞানীদের সফল চন্দ্রাভিযান বিরোধীদের ঘুম কেড়েছে— পৃঃ ১১

৭৬ বর্ষ, ১ সংখ্যা।। ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩।। ২৪ ভাদ্র - ১৪৩০।। যুগাব্দ - ৫১২৫।। website : www.eswastika.com



চন্দ্রযান ৩-এর সফল অবতরণ

এক নতুন ইতিহাসের সূত্রপাত


CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

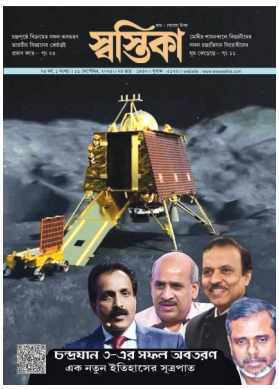
স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৬ বর্ষ ১ সংখ্যা, ২৪ ভাদ্র, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

১১ সেপ্টেম্বর - ২০২৩, যুগাব্দ - ৫১২৫,

Website : www.eswastika.com



সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

কানে তুলো পিঠে কুলো, ইন্ডিজোট—আরশোলা আবার পাখি ? □ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় □ ৬

জনস্বার্থ নিপাত যাক, শাসকস্বার্থ জিন্দাবাদ □ সুন্দর মৌলিক □ ৭

চন্দ্র বিজয় একটি সাংস্কৃতিক বিজয়ও বটে □ স্বপন দাশগুপ্ত □ ৮

চন্দ্রযান ৩-এর সাফল্য চন্দ্র-কূটনীতিতেও ব্যবহার করবে মোদীর ভারত □ বিশ্বামিত্র □ ১০

মোদীর শাসনকালে বিজ্ঞানীদের সফল চন্দ্রাভিযান বিরোধীদের ঘুম কেড়েছে □ আনন্দ মোহন দাস □ ১১

মমতার তৃণমূলও চন্দ্রযান পাঠাতে পারত □ শিলাদিত্য ঘোষ □ ১৩

বিজ্ঞানমনস্কতার অর্থ নিজের ধর্ম-সংস্কৃতিকে পরিত্যাগ করা নয় □ দিগন্ত চক্রবর্তী □ ১৬

দত্তপুকুরের বিস্ফোরণ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল পশ্চিমবঙ্গ আছে পশ্চিমবঙ্গেই □ মণীন্দ্রনাথ সাহা □ ১৭

মণিপুর নিয়ে কংগ্রেস এত সক্রিয় কেন ? □ সাধন কুমার পাল □ ১৮

চন্দ্রপৃষ্ঠে বিক্রমের সফল অবতরণ ভারতীয় বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্বই প্রমাণ করে □ মন্দার গোস্বামী □ ২৩

চাঁদের মাটিতে ভারতের 'বিক্রম' এক নতুন ইতিহাসের সূত্রপাত □ অংশুমান গঙ্গোপাধ্যায় □ ২৬

চন্দ্রযান ৩-এর সফল অবতরণ নতুন ভারতের অগ্রগতির পদক্ষেপ □ ড. জয়ন্ত রায়চৌধুরী □ ২৯

দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা □ কানুরঞ্জন দেবনাথ □ ৩১

বিশ্বকর্মা : শাস্ত্রে ও সাহিত্যে □ রবিব্রত ঘোষ □ ৩৩

প্রাচীন ভারতীয় গণিতশাস্ত্র একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা □ শাশ্বত বসু □ ৩৫

হিন্দুশূন্য করতে বাংলাদেশে 'বিএনপি' আবারও ক্ষমতায় আসার জন্য ষড়যন্ত্র করছে □ সেন্টু রঞ্জন চক্রবর্তী □ ৩৮

নিয়মিত বিভাগ :

চিঠিপত্র : ১৯-২০ □ অঙ্গনা : ২১ □ সুস্বাস্থ্য : ২২ □ সমাবেশ সমাচার : ৪৩-৪৭ □ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ □ সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৮

প্রকাশিত হবে ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

প্রকাশিত হবে ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

এক দেশ এক ভোট

১৯৬৭ সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষে বিধানসভা এবং লোকসভার ভোট একই সঙ্গে হতো। কিন্তু বর্তমানে বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভা এবং লোকসভার ভোট বিভিন্ন সময়ে হয়ে থাকে। যার ফলে সারা বছর ধরে দেশের কোনো না কোনো প্রান্তে ভোটের দামামা বাজে। নির্বাচনী বিধি লাগু হওয়ার জন্য ও ভোটের কাজে সরকারি কর্মীরা ব্যস্ত হয়ে পড়ায় বিবিধ উন্নয়নমূলক কাজকর্ম যেমন স্তব্ধ হয়ে পড়ে, তেমনই স্কুল, কলেজ ভোটের কাজে ব্যবহৃত হওয়ার ফলে পড়াশুনা বন্ধ হয়ে যায়। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ভোট কর্মী, নিরাপত্তা কর্মী মোতায়েন ও ভোট সংক্রান্ত সামগ্রী সরবরাহের জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়।

তাই বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার দেশের উন্নয়নের স্বার্থে 'এক দেশ এক ভোট' নীতি বাস্তবায়নের কথা বলেছে।

এই বিষয়ে বিশেষ আলোকপাত করা হবে আগামী সংখ্যার স্বস্তিকায়।

দাম ষোলো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION
A/C. No. : **103502000100693**
IFSC Code : **IOBA0001035**
Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK
Branch : **Sreemani Market**
Kolkata-700 006

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে। সকল পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীর নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁরা যেন এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন এবং আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা করেন।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেকSubhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**
Bank A/c --- 103502000100693
IFSC -- IOBA0001035
Bank -- Indian Overseas Bank
Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

জয় অনুসন্ধান

সম্প্রতি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতিতে ভারত সমগ্র বিশ্বের নজর কাড়িয়াছে। স্বাধীনতার পর শান্তির বার্তাবাহক হইবার বাসনায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগাইয়া দেশকে শক্তিধর করিবার পথ রুদ্ধ করা হইয়াছিল। সামরিক সরঞ্জাম নির্মাণের কারখানাগুলি বন্ধ করিয়া খেলনা প্রস্তুতের কারখানা করা হইয়াছিল। পরিণামস্বরূপ বৈদেশিক শক্তির নিকট ভারতকে পর্যুদস্ত হইতে হইয়াছিল। স্বাধীন ভারতের চিন্তাই ছিল প্রতিরক্ষা ও খাদ্য সংক্রান্ত দিকগুলির সমাধান করিয়া দেশকে অগ্রগতির পথে লইয়া যাওয়া। ইহার গুরুত্ব অনুভব করিয়া দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী দেশবাসীর সম্মুখে স্লোগান তুলিয়াছিলেন— জয় জওয়ান, জয় কিষাণ। ইহারই বহু বৎসর পর প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী রাজস্থানের পোখরাণে পরীক্ষামূলক দ্বিতীয় পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটাইয়া ভারতকে পরমাণু শক্তিধর দেশে উন্নীত করিয়াছিলেন। এই সময় লালবাহাদুর শাস্ত্রীর সেই স্লোগানে তিনি যুক্ত করিলেন 'জয় বিজ্ঞান।' তাঁহার উত্তরসূরী বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বিজ্ঞানীদের উৎসাহিত করিয়া দেশকে আত্মনির্ভর করিবার সংকল্প গ্রহণ করিয়াছেন। বহুলাংশে সফলও হইয়াছেন। বিজ্ঞানকে কাজে লাগাইয়া মহাকাশ ক্ষেত্রে ভারত এখন সমগ্র বিশ্বের দিশারি হইয়া উঠিয়াছে। সম্প্রতি চাঁদের দক্ষিণমেরুতে চন্দ্রযান-৩-এর সফল অবতরণে এবং রোভার প্রজ্ঞানের সক্রিয়তায় সমগ্র বিশ্ব ভারত এবং ভারতীয় বিজ্ঞানীদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়াছে। সমগ্র বিশ্ব মহাকাশ বিজ্ঞানে ভারতের এই সাফল্যকে কুর্নিশ জানাইতেছে। ভারত ও ভারতবাসীর পক্ষে ইহা কম গর্বের কথা নহে।

কিন্তু ভারতের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির মনোভাব ঠিক ইহার বিপরীত। তাহাদের প্রশংসাবাক্যের আড়ালে কটাক্ষই অধিকমাত্রায় প্রকাশ পাইয়াছে। চন্দ্রযান-৩-এর সফল অবতরণের পরমুহূর্তে দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গ হইতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কেন বিজ্ঞানীদের অভিনন্দন জানাইলেন তাহা লইয়া প্রশ্ন তুলিয়াছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। চন্দ্রযান-৩ সফল না হইলেই বরং তিনি খুশি হইতেন তাহা তাঁহার শারীরিক ভাষায় পরিলক্ষিত হইয়াছে। তাঁহার দলের এক বিধায়ক বলিয়াছেন এত কোটি টাকা ব্যয় করিয়া চন্দ্রাভিযান করিবার কোনো প্রয়োজন ছিল না। সেই টাকা তিনি গরিব মানুষদের জন্য ব্যয় করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। কংগ্রেসের তরফ হইতে বলা হইয়াছে, ইহাতে নরেন্দ্র মোদীর কোনোপ্রকার কৃতিত্ব নাই, ইহার কৃতিত্ব প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর। তাহাদের এক নেতা ইসরোর বিজ্ঞানীদের কেন কয়েক মাস মাহিনা বন্ধ রাখা হইয়াছে বলিয়া নরেন্দ্র মোদীকে এক হাত লইয়াছেন। বামপন্থী নেতারা তো উৎক্ষেপণের দিনই কটাক্ষ করিয়াছেন, ইসরোর বিজ্ঞানীরা কেন তিরুপতি মন্দিরে পূজা দিয়াছেন। ইহাতে এই কথা পরিষ্কার যে, দেশের রাজনৈতিক বিরোধীরা নরেন্দ্র মোদীর শাসনকালে ভারতের এই সাফল্যকে মানিয়া লইতে পারিতেছেন না। চন্দ্রযান-৩-এর সফল অবতরণের পর তাহাদের রাষ্ট্রবিরোধী চরিত্র পুনরায় দেশবাসীর সম্মুখে আরও একবার উন্মোচিত হইয়াছে। এই কথা নির্দ্বিধায় বলা যাইতে পারে, ভারতের রাজনৈতিক বিরোধীরা শুধুমাত্র সরকার বিরোধী নহে, তাহারা শতভাগ রাষ্ট্রবিরোধী।

সকলের স্মরণে থাকিতে পারে, ১৯৭৪ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সময়ে পোখরাণে প্রথম পরীক্ষামূলক পরমাণু বিস্ফোরণ করা হইয়াছিল। কিন্তু মার্কিন চোখরাঙানির ভয়ে তিনি আর অগ্রসর হইবার সাহস দেখাইতে পারেন নাই। ১৯৯৮ সালে অটলবিহারী বাজপেয়ীর শাসনকালে সর্বপ্রকার মার্কিন নজরদারি আড়াল করিয়া সফল দ্বিতীয় পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটানো হইয়াছিল। তিনি দেশকে পরমাণু শক্তিধর দেশে পরিণত করিয়াছিলেন। তাঁহার উত্তরসূরী নরেন্দ্র মোদীর যোগ্য নেতৃত্বে দেশ অগ্রগতির পথে চলিতে শুরু করিয়াছে। দেশের সেনাবহিনী হউক কিংবা বিজ্ঞানী, তাহাদের পাশে দাঁড়াইয়া নিরন্তর উৎসাহিত করিয়াছেন। তাহা করিয়াই তিনি আপামর দেশবাসীর মন জয় করিয়াছেন। সমগ্র বিশ্বও তাঁহাকে নেতা হিসাবে স্বীকার করিয়া লইয়াছে। ভারতের রাজনৈতিক বিরোধীদের গাত্রদাহের ইহাই কারণ। তাহাদের গালমন্দ সত্ত্বেও ১৪০ কোটি দেশবাসীর আশীর্বাদে তিনি দেশকে অগ্রগতির পথে লইয়া চলিয়াছেন। এইক্ষণে তিনি জয় বিজ্ঞানের সহিত যুক্ত করিয়াছেন 'জয় অনুসন্ধান'।

সুভাষিতম্

যঃ পঠতি লিখতি পশ্যতি পরিপৃচ্ছতি পণ্ডিতান উপাশ্রয়তি।
তস্য দিবাকরকিরণৈঃ নলিনীদল ইব বিস্তারিতা বুদ্ধিঃ।।

যিনি পড়েন, লিখেন, দেখেন, প্রশ্ন করে সংশয় দুরীভূত করেন এবং বুদ্ধিমান লোকের সংশ্রবে থাকেন, সূর্যকিরণে পদ্ম প্রস্ফুটিত হওয়ার মতো তাঁর বুদ্ধিও বিকশিত হয়।

কানে তুলো পিঠে কুলো
ইন্ডিজোট—আরশোলা আবার পাখি?

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

বেশিরভাগ রাজনীতিকের জন্য প্রবাদটি প্রযোজ্য। সিপিএম আর কংগ্রেস এখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে এক কাপে 'চা খাচ্ছে' আর এক মঞ্চে বসে 'রা' দিচ্ছে। ছাব্বিশ দলের ইন্ডি-জোটে মমতার সঙ্গে বাম-তৃণমূলকে দেখে মানুষ নির্লজ্জের জোট বলছে। জটিল রাজনৈতিক অবস্থা তৈরির সবচেয়ে বড়ো সুবিধাভোগী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। হলফ করে বলতে পারি মমতার ক্ষতি না চেয়ে সিপিএম তাড়িত বাম বা 'মামু' (মালদা-মুর্শিদাবাদ) কংগ্রেসের নেতারা প্রাতরাশ সারেন না। কেন মমতা? বাইরে থেকে শত্রু নিয়ন্ত্রণের বদলে ভিতর থেকে তা করা সহজ। তাই রাতারাতি গালাগালি গলাগলি হয়ে গিয়েছে। সমালোচনা আর কটূক্তির ঝড়ে তিতিবিরক্ত রাজ্যের বাম-কংগ্রেস নেতারা জানিয়েছে ভোটে একা লড়বে। মমতার নৌকোয় সওয়ারি হবে না।

শুনেছি মমতা সিপিএম নেতা সীতারাম ইয়েচুরিকে কলকাতায় ইন্ডি জোটের বৈঠক ডাকার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। সীতারাম সোজাসাপটা জানিয়ে দেন তার অসুবিধা রয়েছে। সিপিএম বা কংগ্রেসের মতো কোনো কেন্দ্র নির্ভর দলের বিদ্রোহী আস্ফালন অন্তঃসার শূন্য। কেন্দ্রীয় দল যা বলে রাজ্য পার্টিকে তা 'ডিটো' করতে বা মান্যতা দিতে হয়। তাহলে তঞ্চকতার অর্থ ইন্ডিজোট আসলে মায়া জোট। লক্ষ্য নরেন্দ্র মোদী হঠাও। মায়াবাদের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদের মতো নরেন্দ্র মোদীর ফাঁদে ইন্ডি পড়ে কাঁদে। শাসক তৃণমূলের অন্য নাম 'মমতা ব্যানার্জি ফ্যান ক্লাব'। সেখানে একটাই সুবিধা। সেটা কেবল মমতার কথায় চলে। নতুন নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ইন্ডিজোট নিয়ন্ত্রণ কমিটির সদস্য। শুনেছি আহ্বায়ক হতে পারেন।

ইডি-সিবিআই য়ের গুঁতোয় অভিষেকবাবুর শিরে সংক্রান্তি। তাঁর গ্রেপ্তারি আশঙ্কায় মমতা প্রমাদ গুনছেন। ইঙ্গিতও দিয়েছেন। আপোশ প্রার্থী হিসেবে ইন্ডিজোটে অভিষেকবাবু আহ্বায়ক হলে আবাক হওয়ায় নেই। তাতে মমতা এক ঢিলে দু'পাখি মারতে পারবেন। অভিষেক গ্রেপ্তার হলে ইন্ডিজোট দেশজুড়ে জোরদার চক্রান্তের আওয়াজ তুলবে। তার পুরো ফায়দা নেবেন মমতা। সব চাইতে বড়ো সমস্যায় পড়বে সিপিএম আর কংগ্রেস। তাদের নাভিশ্বাস উঠবে। মমতা সেটাই চান। জানেন হবেও তাই। যা পরিস্থিতি তাতে মনে হয় ২০২৪-এর লোকসভা ভোটে বিজেপি এই রাজ্যে (১৬-১৮) টি আসন পাবে আর ইন্ডিজোটের ভাঙাচোরা সঙ্গী হিসেবে মমতা (২০-২২) টি আসন পাবে। সিপিএম (০) আর রাজ্য কংগ্রেস হয়তো (২) টি আসন পাবে। ইন্ডিজোটের থেকে মোদী জোটের ভোট সংখ্যা আনুমানিক ৩ কোটি বেশি।

তবে মোদী জোটে একটি মুখ— নরেন্দ্র মোদী। আর ইন্ডিজোটে তিন মুখ— মমতা, নীতীশ কুমার (জেডিইউ), এম কে স্তালিন (ডিএমকে)। তারা জোটের ৪৬ শতাংশ। ইন্ডি জোটকে লোকসভা জিততে হলে ৫৪০ আসনে আনুমানিক ১৬ লক্ষ করে বাড়তি ভোট পেতে হবে। এখন যেটা কেবল ৭.০৮ লক্ষ। প্রায় অসম্ভব কাজ। ফলে মোদী জোট যে অনায়াসেই লোকসভা জিতবে তা চোখ বুজে বলা যায়। ইন্ডিজোটের দাবি তারা ৬৮ শতাংশ মানুষের প্রতিনিধি। ২০১৯-এ বিজেপির এনডিএ ২১টি রাজ্যের ৭০ শতাংশ মানুষের প্রতিনিধি ছিল আর দেশের ৭৬ শতাংশ এলাকা দখল করেছিল। বিজেপি বিরোধিতার পাশাপাশি মমতা সিপিএম আর কংগ্রেসকে রাজ্য থেকে নির্মূল করতে চান। সেই মতো দাবার ছক সাজিয়েছেন। রাজ্য সিপিএম আর কংগ্রেস সে ছকে মাত হবেই। আর মমতা বিজেপির এজেন্ট তত্ত্ব খারিজ হবে। অভিষেকবাবু গ্রেপ্তার হলে রাজ্যের আসন সংখ্যাচিত্র পালটে বিজেপির দিকে ঢলে পড়বে। রাজ্যের মানুষ জানেন এখানে ইন্ডি-জোট বলে কিছু নেই। আছে মমতা। আছে বিজেপি। আর আছে দু' সানাইয়ে পোঁ— সিপিএম আর কংগ্রেস। ইন্ডি জোটের তিনটি বৈঠকে অংশগ্রহণ করে চতুর মমতা সেই পোঁ বাজিয়ে দিয়েছেন। ওই দু'দলের এখন কানে তুলো আর পিঠে কুলো বাঁধার অবস্থা। শ্যাম রাখি না কুল রাখি। ইন্ডিজোট আসলে আরশোলা। পাখি নয়। খুব শীঘ্র তা বোঝা যাবে।□

জনস্বার্থ নিপাত যাক শাসকস্বার্থ জিন্দাবাদ

নির্দায়েষু দিদি,

'রাজার উঠোন কখনও হয় না বাঁকা, দরকারি এই কথাটা স্মরণ রাখা।'

আর কেউ করুক না করুক আমি এই কথাটা বিশ্বাস করি দিদি। আপনি যখন যা বলেন, আমি সেটাকেই মান্যতা দিই। এটা ঠিক যে মাঝে মধ্যে কিছু বেয়াদব প্রশ্ন করে বসি! তবে এটাও জানি অনুগত ভাইকে আপনি ক্ষমাসুন্দর চোখেই দেখবেন। কিন্তু দিদি সমস্যা হয় তখন, যখন আপনার দলের পক্ষে একাধিক কথাবার্তা উঠে আসে। বুঝতে পারি না কোনটা আপনার মুখের কথা আর কোনটা মুখোশের কথা।

রাজ্যে ডেঙ্গির উপদ্রব গত কয়েক বছরের তুলনায় একটু বেশিই এবার। তেমন বৃষ্টি না হলেও জমা জলে ডেঙ্গির মশা বাড়ছে। কিন্তু দিদি আপনি এত রকম কিছু বলছেন যে, তাতে আমি দিশেহারা কোন কথাটা রাখব, কোন কথাটা ফেলব।

ক'দিন আগে খবরের কাগজে পড়লাম যে, ডেঙ্গি সম্পর্কিত তথ্য বাইরে প্রকাশ হয়ে গেলে সিআইডি তদন্ত হবে জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিকদের বিরুদ্ধে, এমন ভয় দেখিয়েছেন স্বাস্থ্য কর্তারা। আমি জানি এমন বুদ্ধি আপনিই দিয়েছেন। আর কারও হবে না। ঠিকই করেছেন দিদি। কারণ, আমি বিশ্বাস করি, ডেঙ্গি-আক্রান্তে জনস্বার্থ নিপাত যাক।

প্রাণরক্ষার চেয়ে তৃণমূল সরকারের মুখরক্ষাই বেশি জরুরি। নাগরিকের সুরক্ষাকে প্রাধান্য দিয়ে তথ্য প্রকাশ করলে বিপদ হতে পারত। যদিও চিকিৎসক, বিজ্ঞানীরা বলেন, যে কোনও সংক্রামক রোগের মোকাবিলার জন্য তথ্য-পরিসংখ্যানের প্রয়োজন হয়। রোগ কোন এলাকায় কীভাবে ছড়াচ্ছে, কোন ধরনের ডেঙ্গির প্রাদুর্ভাব বেশি, এই তথ্যগুলি যত পাওয়া যাবে, ততই প্রতিরোধের কাজে গতি আসবে। যেমন, ভারত ও বিদেশের বিজ্ঞানীদের মিলিত উদ্যোগে কোভিড সংক্রমণ ছড়ানোর নকশা মিলেছিল। তথ্য গোপন করলে গুরুত্বপূর্ণ বহু তথ্য অজানা থেকে যেত। কিন্তু যাঁরা এই সব বলেন তাঁরা তো রাজনীতিক নন, সরকারও চালান না। নরেন্দ্র মোদী প্রকাশ করেছিলেন বলে আপনাকেও করতে হবে এমন কী কথা আছে!

তবে দিদি, আমার অন্য একটা জিজ্ঞাসা রয়েছে। রাজ্যে ডেঙ্গি কেন বাড়ছে তা নিয়ে আপনি এবং আপনার ভাইয়েরা নানা রকম কথা বলেছেন। এর মধ্যে কোনটা যে বিশ্বাস করব ভেবে পাচ্ছি না। একটু যদি হেল্প করেন তবে ভালো হয়।

এ রাজ্যে ডেঙ্গি ছড়ানোর পিছনে বাংলাদেশের মশাদের সক্রিয় ভূমিকা থাকতে পারে বলেও আপনি জানিয়েছেন। বলেছিলেন, 'বাংলাদেশে খুব ডেঙ্গি হচ্ছে। আমাদের বাড়তি সাবধানতা নিতে হবে। সীমান্ত এলাকায় মশা ওপার থেকে এপারে আসে, এপার থেকে ওপারে যায়। দু'পারেই অনেক লোকও যাতায়াত করেন।' আপনি এটাও বলেন যে, 'বাংলাদেশে কিছু হলে এখানে তার প্রভাব পড়ে। তাই সীমান্ত এলাকাগুলিতে ডেঙ্গি প্রতিরোধে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে।' আমার তো মনে হয়, বাংলাদেশ থেকে ডেঙ্গির মশা এই রাজ্যে ঢুকছে এবং কামড়াচ্ছে, তার জন্য বিএসএফ দায়ী। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এর দায় এড়িয়ে যেতে পারেন না। আপনার কোনও দায় নেই। সব দায় কেন্দ্রের। তাই তো আপনাকে 'নির্দায়েষু' বলে সম্বোধন করেছি এই চিঠিতে।

আদালতেরও দোষ রয়েছে দিদি। মানছি, তৃণমূল অনেক অনিয়ম করে পঞ্চায়েত ভোটে জিতেছে। তা বলে বোর্ড গঠন আটকে রাখা ঠিক হয়নি। কারণ, আপনিই বলেছেন, পঞ্চায়েত বোর্ড গঠন হয়নি বলে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে ডেঙ্গি প্রতিরোধের কাজ ব্যাহত হচ্ছে। কিন্তু বিরোধীদের প্রশ্ন রয়েছে। পঞ্চায়েত সদস্যদের নির্দেশের জন্য কি বসে রয়েছেন সরকারি আধিকারিক ও কর্মীরা? ডেঙ্গি নিয়ন্ত্রণের সরকারি রূপরেখা তো গ্রাম থেকে জেলা, সর্বস্তরের কর্মীদের কাছে থাকার কথা। মুখ্যমন্ত্রীকে কি এটা প্রশ্ন করা যায় যে, কলকাতা-সহ পুরসভাগুলিতে বোর্ডের পরিবর্তন না হওয়া সত্ত্বেও ডেঙ্গি প্রতিরোধে সেগুলির এমন বেসামাল দশা কেন? নির্মাণের জন্য জমা জল, পরিত্যক্ত বাড়ি, উদাসীন গৃহস্থ— ডেঙ্গির প্রকোপের ব্যাখ্যায় সেই চর্বিতচর্বণ শোনা গিয়েছে কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমের মুখে। তিনি আবার এমনও বলেছেন যে, গ্রামে গ্রামে এত উন্নয়ন হয়েছে যে জল বেশি জমছে। হাস্যকর হলেও যুক্তি তো বটে। তাতেই আমি গুলিয়ে ফেলছি। কোনটা মুখের কথা, কোনটা মুখোশের কথা ভেবে। □

অতিথি কলম



স্বপন দাশগুপ্ত

চন্দ্র বিজয় একটি সাংস্কৃতিক বিজয়ও বটে

এটি একটি সাংস্কৃতিক বিজয়ের জয় পতাকা উড়িয়েছে। সুন্দরভাবে মিশ্রণ ঘটেছে প্রাচীন ভাবে লালিত বিশ্বাসের সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের। মহাজ্ঞানীদের মনে হতে পারে এটি ছিল অসম্ভব।

ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা দপ্তরে তখন কাল্পনিক বিস্ময়ের বর্ণনা সূচক 'চাঁদের হাট' বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে। ইসরোর বৈজ্ঞানিককুল সারা জীবনের আনন্দ সম্মিলিতভাবে ব্যক্ত করছেন। 'জয় হো' ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত। সেখানকার নিজস্ব টেলিভিশনে ভেসে উঠেছে তাদের প্রতি প্রধানমন্ত্রীর বুকভরা অভিনন্দন প্রদানের দৃশ্যটি। ২৩ আগস্ট ২০২৩, ভারত ইতিহাসের সর্বকালীন সোনাঝরা দিন।

ভারতীয়রা কোটি কোটি সংখ্যায় তাদের চিরকালীন মনোবাঞ্ছা পূরণের ইঙ্গিত প্রথম পেয়েছিল যে 'চন্দ্রযান-৩'-এর সফল অবতরণেই হতে চলেছে তা টেলিভিশনে সম্প্রচারিত এই বৈজ্ঞানিক খুশিতে একে অপরকে অভিনন্দিত করার প্রথম আনন্দময় দৃশ্যে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে বলা হয় এরা অনায়াসে আন্তর্জাতিক সীমান্তকে অতিক্রম করার ক্ষমতা ধরে। কিন্তু ইসরোর সেই সম্মেলন কক্ষে সেদিন সারা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের নানা ভাষাভাষী মানুষের যে মিলনক্ষেত্র এবং এক অনুভূতির প্রকাশ হয়েছিল তা সামগ্রিক ভারতীয়ত্বের অকাট্য প্রমাণ। হয়তো আমেরিকার ক্যালির্ফোনিয়ায় সেদিন সর্বাধুনিক Cutting edge প্রযুক্তি যাকে বলে সেই প্রযুক্তিসম্পন্ন সংস্থাগুলি সিলিকন ভ্যালিতে বসে আসন্ন ভবিষ্যতে কী দাঁড়াবে তা নিয়ে চিন্তান্বিত হয়ে উঠছিল।

কিন্তু এ বিষয়ে কোনো দ্বিধা ছিল না যে গত সপ্তাহের চন্দ্রাবতরণ নিঃসন্দেহে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণায় এক গগনচুম্বী পদক্ষেপ ও বিশাল সাফল্য। এরই সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ ছিল সারা দেশের কাছে এর অভিঘাত। সংখ্যাহীন হোয়াটস্ অ্যাপ মেসেজে ১৯৬৩ সালের একটি রকেট হেডকে সাইকেলে নিয়ে যাওয়ার ছবির সঙ্গে 'চন্দ্রযান-৩'-এর 'বিক্রম' যানের সর্বশেষ ছবি একসঙ্গে জুড়ে এটা প্রমাণ করা হয়েছে ভারতের কর্মশৈলী একান্তই তার নিজস্ব। শুধু তাই নয়, এই অভিযান করতে সর্বনিম্ন খরচ করে আগে থেকেই মহাকাশ গবেষণায় এগিয়ে থাকা দেশগুলি যারা সর্বদাই নাক উঁচুভাবে ভারতের কার্যকলাপ নজর করছিল তাদের স্তম্ভিত করে দেয়।

এই সূত্রে ৯ বছর আগে মোদীর 'আত্মনির্ভর ভারত' ও 'মেক ইন ইন্ডিয়া' পরিকল্পনা দুটিকে আপাদমস্তক বিদ্রূপ করেছিল তথাকথিত এলিট ইন্ডিয়া। আখ্যা দিয়েছিল প্রায় উন্মাদ হিন্দুত্বের ঘোষণা। যার অর্থ নিজেদের গুটিয়ে আলাদা করে রাখা। সেই ২০১৪ সালে নিউইয়র্কের বিখ্যাত কার্টুন ক্লাব প্রকাশ করেছিল একদল ভারতীয় ধুতি পরে, সঙ্গে গোরু নিয়ে অভিখ্যাত স্পেসক্লাবের দরজায় কড়া নাড়ছে। ভেতরে ভারী ভারী লোক বসে আছে। আজ কারও মুখে তিলমাত্র হাসি নেই। কপালে টিপ লাগানো, শাড়ি পরা ভারতীয় মহিলা বা তিলকধারী ভারতীয় একটা বিষয় নিশ্চিত করল।

হয়তো এই ধরনের মহা চমৎকারিত্বের বিষয়বস্তু ভরা সাফল্যের প্রয়োজন ছিল অন্য একটি বিষয়কে অর্থহীন প্রমাণ করতে। রাহুল গান্ধী তাঁর সাম্প্রতিক একটি ইউরোপ সফর সম্পর্কে বলতে গিয়ে একটি সভায় জানাচ্ছেন যে ইউরোপিয়ান নেতৃস্থানীয় ও কূটনীতিকরা তাঁকে বলেছেন যে তাঁদের সমতুল ভারতীয়রা আজকাল আর তাঁদের কথা শুনতে উৎসাহী নন, এতে রাহুল অত্যন্ত হতমান বোধ করেছেন। রাহুলের

মনে হয়েছিল যে কূটনীতিকরা বোঝাতে চেয়েছেন যে যাবতীয় উচ্চপদস্থ আমলাদের কাছ থেকে সব ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা মোদী সরকারের কাছে অর্থহীন হয়ে পড়েছে। কিন্তু যে বিষয়টা রাহুলের চিন্তাকে এড়িয়ে গেছে যে নতুন জাতীয়তাবোধের উত্থান পুরানো বুদ্ধিজীবীদের পিঠ চাপড়ানো আদৌ আশা করেনি। তারা এর প্রয়োজন জরুরি মনে করেনি। এই ধরনের চিরাচরিতভাবে গ্রাহ্য করে, মেনে নিয়ে চলার একপেশে অভ্যাসকে প্রথম অগ্রাহ্য করেছিলেন সৌরভ গাঙ্গুলি লর্ডসের ব্যালকনি থেকে। ভারত সেইদিন একটি অসাধারণ জয় পেয়েছিল। সৌরভ তাঁর শার্ট খুলে হৃদয়ের আনন্দে হাওয়ায় ঘুরিয়েছিলেন। কিন্তু জাতীয় পুনরুত্থানের স্পিরিটটিকে আমাদের আগেই বোঝা উচিত ছিল যখন চরম মানসিক দৃঢ়তা ও কর্মদক্ষতায় বিনামূল্যের রেশন ও সারা দেশে বিনামূল্যের কোভিড টিকাকরণের সফল ব্যবস্থা হয়েছিল চূড়ান্ত মহামারীর আপতকালীন অবস্থাতেই। শুধু তাই নয়, বরাবরের ব্যবস্থা থেকে সরে এসে তাকে প্রায় বিনষ্ট করে অতি সহজে ক্যাশলেশ মানি ট্রান্সফার কেবলমাত্র ফোনের মাধ্যমে চালু করে সরকার যে ইঙ্গিত দিয়েছিল তখনই ভারত সম্পর্কে ধারণা বদলের সময় সূচিত হয়েছিল। সারা বিশ্বের ভারত সম্পর্কে উন্নাসিক ও অবহেলার চোখে দেখা গোষ্ঠী এই সময়টিকেও ইতিবাচক সংকেত হিসেবে নিতে পারেনি। ভারতের বদলে যাওয়া ছিল তাদের কাছে অবিশ্বাস্য।

মোদী ও তাঁর সরকার সম্পর্কে সন্দেহবাদীদের সন্দিগ্ধ মন এই সফল চন্দ্রযান-এর ফলে সাময়িকভাবে নীরব হয়ে পড়েছে নিশ্চিত। এর মধ্যে সেই ব্যক্তিরাও রয়েছে যারা এই সাফল্যের পর ইসরোর টেলিকাস্টের সঙ্গে দেশের প্রধানমন্ত্রীর বাণী কেন শোনানো হলো, তাতে তারা ক্ষুব্ধ। এই ব্যথিত বুদ্ধিজীবী শ্রেণী যারা ২০১৪ সালের মে মাসের পর থেকে প্রায় প্রত্যেকদিন পরিকল্পনা করছিল কী করে ভারতে এমন রাজনৈতিক দলকে ক্ষমতাসীন করা যাবে যারা প্রাচীন পরিবারবাদী উত্তরাধিকার রক্ষায় বিশ্বাসী।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উভয়ক্ষেত্রেই তারা বর্তমানে ক্রম অগ্রসরমান। এই চন্দ্রে অবতরণের প্রাক্‌মুহূর্তেই তারা প্রাচীন বিশ্বখ্যাত অরকেসট্রা পরিচালক জুবিন মেহেতাকে নিয়ে একটা রাজনৈতিক বিতর্ক তৈরি করে। প্রচেষ্টাটি সফল না হলেও এর পেছনে কিন্তু ছিল প্রচ্ছন্ন ক্ষতিকারক মতলব। ভারতে বসবাসকারী মুসলমানরা এখন বিপন্ন, যেমন বিপদগ্রস্ত ভারতীয় গণতন্ত্র— এই প্রচারটা চালায় পশ্চিমি প্রচারমাধ্যম।

তবুও মহাকাশ ক্লাবে স্থান পাওয়া বা সর্বাধুনিক প্রযুক্তির প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে ভারতীয় প্রতিভাধরদের জাতীয় উন্নয়নের যে কোনো ক্ষেত্রে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে কাজ করে যাওয়ার উদাহরণও চট করে পাশ্চাত্য সন্দেহবাদীদের মনে ভারতের উচ্চাবস্থান স্বীকার করবে না। একজন মুখ্যমন্ত্রীর সগর্বে অভিনেতা রাকেশ রোশনকে চাঁদে পাঠানো, তাঁর সম্ভবত জন্ম হয়নি— এসব পর্যাপ্তভাবে প্রমাণ করে যে এই সব রাজনীতিবিদ কখনই চান না যে দেশ গড়পড়তা বিষয়ের বাইরে কোনো আন্তর্জাতিক সম্মান জিতুক। তারা এমন বিষয়কেই বাহবা দেন যেখানে ভারত কেবলমাত্র একটি মধ্য আয়ের দেশ হিসেবেই চিরকাল বেঁধে রাখবে। অবশ্য বিশ্বের নানা কর্পোরেট কোম্পানির পরিচালক পর্ষদে দু-একজন ভারতীয় থাকতে পারে কিন্তু সামগ্রিক ভারতবাসী হিসেবে বড়ো সাফল্য পাওয়া গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁদের গুরুত্ব অনেকটাই অজ্ঞানতাপ্রসূত হয়ে ক্ষয়িষ্ণু শক্তির ধামাধরা হয়ে থাকার বিষয়ে রয়েছে। এরা জাতীয়তাবোধের বিরোধিতা করে মানুষের অক্লান্ত কর্ম উদ্দীপনাকে প্রতিহত করতে চায়। যারা ধীরে হলেও নিজেদের পরাধীনতা থেকে মুক্তির চেষ্টা করছে। আসন্ন 'দেশীয় বিজ্ঞান' যুগের প্রযুক্তি, প্রয়োগ ইত্যাদির সম্ভাবনা থেকেও এই সাফল্যময় চন্দ্রাভিযানের প্রভাব বিশাল।

এটি একটি সাংস্কৃতিক বিজয়ের জয় পতাকা উড়িয়েছে। সুন্দরভাবে মিশ্রণ ঘটেছে প্রাচীন ভাবে লালিত বিশ্বাসের সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের। মহাজ্ঞানীদের মনে হতে পারে এটি ছিল অসম্ভব।

(লেখক প্রাবন্ধিক ও রাজ্যসভার সাংসদ)

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার যে সকল বার্ষিক গ্রাহকের মেয়াদ শেষ হয়েছে বা শেষ হতে চলেছে তাঁদের কাছে বিনীত নিবেদন, আপনারা পরবর্তী বছরের জন্য গ্রাহকমূল্য ৭০০ টাকা অবিলম্বে জমা দিয়ে গ্রাহকপদ নবীকরণের মাধ্যমে আমাদের সহযোগিতা করুন। স্বস্তিকার প্রতিনিধির মাধ্যমেও টাকা পাঠাতে পারেন।

নতুন গ্রাহক হলে সম্পূর্ণ নাম-ঠিকানা, ফোন নম্বর (পিন কোড সহ) অবশ্যই পাঠাবেন।

ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

শোকসংবাদ



উত্তর দমদম নগরের পূর্বতন ব্যবস্থা প্রমুখ রমেনচন্দ্র ঘোষের সহধর্মিণী করুণা ঘোষ গত ২৫ জুলাই পরলোকগমন করেন। তিনি ২ কন্যা ও ২ নাতি রেখে গেছেন।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বীরভূম বিভাগ গ্রাম বিকাশ প্রমুখ আশিস মণ্ডলের বাবা দেবনারায়ণ মণ্ডল গত ২৩ আগস্ট পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯২ বছর তিনি ১ পুত্র, ২ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

চন্দ্রযান ৩-এর সাফল্য চন্দ্র-কূটনীতিতেও ব্যবহার করবে মোদীর ভারত

শুধু বিজ্ঞান-গবেষণা নয়, চন্দ্রযান-৩-এর সাফল্য সার্বিকভাবে বিশ্বের দরবারে ভারতের সম্মান বহুগুণ বৃদ্ধি করেছে। এই চন্দ্রযান মিশন যা ভারতের 'লুনার এক্সপ্লোরেশন প্রোগ্রাম' নামে পরিচিত— তার আওতায় ইসরোর বিজ্ঞানীরা এ পর্যন্ত চাঁদের অভিমুখে মোট তিনটি মহাকাশযান পাঠিয়েছেন। ২০০৩ সালে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী প্রথমবারের মতো ভারতে লুনার এক্সপ্লোরেশন বা চন্দ্র অভিযানের কথা ঘোষণা করেন। পরবর্তী পর্যায়ে, মনমোহন সিংহের প্রধানমন্ত্রিত্বকালে ২০০৮ সালে উৎক্ষেপণ করা হয় চন্দ্রযান-১, যা সফলভাবে চাঁদের কক্ষপথে বা লুনার অরবিটে প্রবেশ করেছিল। এরপর মোদীর প্রধানমন্ত্রিত্বকালেই কয়েক বছর আগে ২০১৯ সালের ৭ সেপ্টেম্বর চন্দ্রযান-২ চাঁদে অবতরণের চেষ্টা করলেও সেই অভিযান অল্পের জন্য ব্যর্থ হয়েছিল। চন্দ্রযান-২-এর ল্যান্ডার বিক্রম যখন টাচডাউনের চেষ্টা করে, তখন ব্রেকিং সিস্টেমে কিছু অসঙ্গতির কারণে সেটি চাঁদের বুকে ক্র্যাশ করে।

এর ফলোআপ হিসেবেই চন্দ্রযান-৩-এর পরিকল্পনা করা হয়, যার প্রধান লক্ষ্য ছিল চাঁদের বুকে নিরাপদে 'সফট ল্যান্ডিং' নিশ্চিত করা এবং তারপর চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকেই বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষানিরীক্ষা চালানো। চন্দ্রযান-৩-এর বৈশিষ্ট্য হলো এটি অবতরণ করেছে চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে, যেখানে সম্প্রতি জলের অস্তিত্ব প্রমাণিত হওয়ার পর সারা পৃথিবী জুড়ে বিজ্ঞানীদের আগ্রহ ও মনোযোগ এখন চন্দ্রপৃষ্ঠের এই বিশেষ অঞ্চল ঘিরেই। এই সফ্‌ট ল্যান্ডিংয়ের পর এখন পরবর্তী কিছুদিন ধরে চন্দ্রযান-৩-এর মুন রোভার 'প্রজ্ঞান' চাঁদের বুক থেকে নানা ছবি ও তথ্য পাঠাতে থাকবে। দিন পনেরোর মধ্যে চন্দ্রযান-৩ পর্যায়ক্রমিকভাবে একটার পর একটা পরীক্ষানিরীক্ষা চালাবে। যার মধ্যে চন্দ্রপৃষ্ঠে কী কী ধরনের খনিজ পদার্থ আছে, তার একটি স্পেক্ট্রোমিটার অ্যানালিসিসও থাকবে।

বলা বাহুল্য, চন্দ্রযান-৩-এর সাফল্য ভারতের মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রেও মাইলস্টোন হিসেবে পরিগণিত হবে। কিন্তু দেশের কী দুর্ভাগ্য, প্রথম থেকেই চন্দ্রযান-৩ নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় কিছু অনাবশ্যক বিতর্ক তৈরি করা হয়েছে। প্রথমত, তিরুপতি, বেঙ্কটচলপতি মন্দিরে বালাজী (শ্রীবিষ্ণু)-র পুজো কেন দিলেন মহাকাশ বিজ্ঞানীরা। পুজো দেওয়ায় তাঁদের অপরাধটা কোথায় হলো, তা বোঝা গেল না। প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় সংস্কৃতিতে কোনো শুভ অনুষ্ঠান আরম্ভ হওয়ার আগে আরাধ্য দেবতার কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা করার প্রথা আছে। ইসরোর বিজ্ঞানীরা সেই রীতিটাই পালন করার চেষ্টা করেছেন মাত্র। শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান মহাকাশ কেন্দ্র থেকে চন্দ্রযান-৩-এর উৎক্ষেপণের আগেই এনিয়ে 'গেল গেল' রব উঠেছিল সোশ্যাল মিডিয়ায়। কেউ কেউ আবার এর মধ্যে হিন্দুয়ানির গন্ধ পেয়ে উৎকণ্ঠিত বোধ করছিলেন। কিন্তু এই হিন্দুফোবিকদের উদ্দেশে একটা কথা বলার, এর সঙ্গে বিশ্বাসের বা ধর্মের সম্পর্ক যত না আছে, তার চাইতে সনাতন ভারতীয় সংস্কৃতি, তথা হিন্দু সংস্কৃতির সম্পর্ক অনেকগুণ বেশি আছে। বিজ্ঞানের সঙ্গে যার বিন্দুমাত্র বিরোধ নেই। বিজ্ঞানী হওয়া মানেই দেশের সংস্কৃতিকে ভুলে যাওয়া নয়।

দ্বিতীয়ত, চন্দ্রযান-৩-এর সাফল্যের পর সোশ্যাল মিডিয়ায় একদল মানুষ আবার নেহরুর জয়গানে মুখরিত হয়েছেন। কারণ নেহরু নাকি ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরো তৈরি করেছিলেন। প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে, বিখ্যাত ভারতীয় মহাকাশ বিজ্ঞানী বিক্রম সারাভাইয়ের উদ্যোগে প্রধানমন্ত্রী নেহরু ১৯৬২ সালে পরমাণু শক্তি বিভাগের অধীনস্থ ন্যাশনাল কমিটি ফর স্পেস রিসার্চ প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠানটিই পরবর্তীকালে ১৯৬৯ সালে ইসরোতে পরিণত হয়। তার পাঁচ বছর আগেই নেহরু মারা গেছেন। সুতরাং ইসরো তৈরির পেছনে নেহরুর পরোক্ষ হাত থাকলেও প্রত্যক্ষ কোনো হাত ছিল না। বরং মোদীকে আক্রমণ করতে নেহরুকে উচ্চাসনে বসাতে কিছু লোক বিক্রম সারাভাইয়ের কৃতিত্বকেই অস্বীকার করলো। তবে চন্দ্রযান-৩-এর ব্যাপারে মোদী সরকারের কৃতিত্ব স্রেফ বিজ্ঞান গবেষণাতেই সীমাবদ্ধ নেই, তা দেশের অর্থনীতি, কূটনীতিকেও সমৃদ্ধ করবে। অর্থাৎ চন্দ্র অভিযানের এই সাফল্যকে কাজে লাগিয়ে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতেও বড়োসড়ো প্রভাব ফেলতে চলেছে মোদী সরকারের নেতৃত্বাধীন ভারত।

ভারতের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জিতেন্দ্র সিংহ তো ইতিমধ্যেই পূর্বাভাস করে রেখেছেন, আর মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই ভারতের স্পেস সেক্টর বা মহাকাশ খাত এক ট্রিলিয়ন (এক লক্ষ কোটি) ডলারের অর্থনীতিতে পরিণত হবে। তথ্যাভিজ্ঞ মহলের মতে, চন্দ্রযান-৩-এর অভূতপূর্ব সাফল্যের পর ভারতের পক্ষে এই কাজটি করাই হবে মাস্টারস্ট্রোক। তক্ষশীলা ইনস্টিটিউটে মহাকাশ ও ভূরাজনীতির গবেষক আদিত্য রামনাথন মনে করছেন, এই সাফল্য ভারতের তরুণ প্রজন্মের একটা বড়ো অংশকে মহাকাশচর্চায় উৎসাহিত করবে এবং তারা এটাকে পেশা হিসেবেও নিতে চাইবেন। চাঁদের বুকে বিপুল পরিমাণে মূল্যবান খনিজ বা প্রচুর পরিমাণ জ্বালানির উৎসের সন্ধান মিলতে পারে— এই সম্ভাবনাও সাম্প্রতিককালে বহু দেশকে চন্দ্র অভিযানে আকৃষ্ট করেছে। সব মিলিয়ে লুনার ডিপ্লোম্যাসিতেও কয়েক কদম এগিয়ে রইলো ভারত। □

মোদীর শাসনকালে বিজ্ঞানীদের সফল চন্দ্রাভিযান বিরোধীদের ঘুম কেড়েছে

আনন্দ মোহন দাস

আজকের দিনে লিখতে বসে মনে পড়ে গেল অতুলপ্রসাদ সেনের সেই বিখ্যাত গান 'বল বল বল সবে, শত বীণা বেণুরবে, ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।' সত্যিই তো আজ ভারতবাসীর আনন্দের দিন, গর্বের দিন। ভারতবর্ষ জগদ্‌গুরু হওয়ার পথে আর এক ধাপ এগিয়ে গেল। জগৎসভায় শ্রেষ্ঠত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথে মুকুটে অর একটি পালক যুক্ত হলো। ২৩ আগস্ট, ২০২৩ ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায় সূচিত হলো। নরেন্দ্র মোদীর আমলে ইসরোর বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টায় চন্দ্রযান-৩ 'বিক্রম' পৃথিবী থেকে ৩,৮৪,৪০০ কিলোমিটার অতিক্রম করে সাফল্যের সঙ্গে চাঁদের মাটিতে অবতরণ করে ভারতের বিজয় পতাকা তুলে ধরেছে। এযাবৎকালের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আজকের দিনে ইসরোর প্রতিষ্ঠাতা বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী বিক্রম সারাভাইয়ের নাম অবশ্যই উল্লেখ করতে হয়। ১৪০ কোটি ভারতবাসীর উৎকণ্ঠার অবসান ঘটিয়ে নির্ধারিত ঠিক সন্ধ্যা ৬টা ৪ মিনিটে চন্দ্রযান-৩ 'বিক্রম' চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছে গেল। ৭০ লক্ষের বেশি মানুষ টিভিতে লাইভ শো দেখে এই ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী থাকলেন। এমনকী রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক ডাঃ মোহনরাও ভাগবত শত ব্যস্ততার মধ্যেও লাইভ শো দেখে বিজ্ঞানীদের এই কৃতিত্বকে সম্মান জানিয়েছেন। এই সাফল্যে ইসরোর বিজ্ঞানীদের তিনি অভিনন্দন জানিয়েছেন।

অস্বীকার করার উপায় নেই, মোদীর শাসনকালে দেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে ইতিহাস রচিত হলো। ইসরোর বিজ্ঞানীদের বিগত চার বছরের অক্লান্ত পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও বুদ্ধিমত্তা এই সাফল্য এনে দিয়েছে কোনো সন্দেহ নেই। ভারতের বিজ্ঞানীরা বিশ্বের কাছে আবার প্রমাণ করে দেখালেন তাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রজ্ঞার নমুনা। ভারতবর্ষ যে প্রাচীনকাল থেকেই জ্ঞান ও বিজ্ঞানে বিশ্বকে পথ দেখিয়েছে, তারই আর একটি নিদর্শন হলো চন্দ্রযান-৩-এর সফল অবতরণ। বিজ্ঞানীদের এই কৃতিত্ব বিশ্বের সামনে দেশের মান উজ্জ্বল করেছে। ভারতবর্ষ হলো প্রথম দেশ যে চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে সর্বপ্রথম পা রেখেছে যা বিশ্বব্যাপী ভারতীয় বিজ্ঞানীদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছে। ভারত যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে অনেক এগিয়ে রয়েছে তা বিশ্বের সামনে তুলে ধরেছে। আমেরিকা, চীন, রাশিয়ার পর চতুর্থ দেশ ভারত সাফল্যের সঙ্গে এই যান পাঠাতে সক্ষম হয়েছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে ব্রিকস সম্মেলন থেকেই ইসরোর বিজ্ঞানীদের চরম সাফল্যে অভিনন্দন জানিয়েছেন এবং তাঁদের কৃতিত্বকে কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করেছেন।

> **প্রকৃতপক্ষে বিরোধীরা মোদীর নেতৃত্বে ভারতের এই কৃতিত্বকে স্বীকার করতে পারছেন না। সেজন্য আইএনডিআইএ জোটের নেতারা কোনো না কোনো ভাবে সাফল্য থেকে অন্য দিকে দৃষ্টি ঘোরাতে চেষ্টা করে চলেছেন।**

এই হলো, আমাদের প্রধানমন্ত্রী, যিনি সরকারের পক্ষ থেকে সর্বদা বিজ্ঞানীদের পাশে থেকে উৎসাহিত করে থাকেন। আমরা এও দেখেছি চন্দ্রযান-২-এর ব্যর্থতায় তদানীন্তন ইসরোর চেয়ারম্যান শিবনকে কীভাবে তিনি সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। তাঁর এই অভিভাবক সুলভ আচরণ যে দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তিনি সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। সুতরাং এই সাফল্যে তাঁর অবদানকেও আমরা অস্বীকার করতে পারি না। স্বাভাবিকভাবে সারা বিশ্ব আজ ভারতের এই সাফল্যে দুই হাত তুলে সাধুবাদ জানিয়েছে। সাম্প্রতিককালে রাশিয়ার যান লুনা-২৫ বিফল হওয়ার পরও সে দেশের প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ভারতকে অভিনন্দন জানাতে কার্পণ্য করেননি। স্বাভাবিকভাবেই ব্রিটেন, আমেরিকা, জার্মান, ফ্রান্স, দক্ষিণ আফ্রিকা-সহ অনেক দেশ ভারতকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। ব্রিটেনের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার উচ্ছ্বসিত হয়ে বলতে দ্বিধা করেননি, ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসনকাল হলো মোদীর শাসনকাল, যা ভারতকে সমস্ত দিক থেকে সারা বিশ্বে অনেকটাই এগিয়ে রেখেছে। বিশ্বের সমস্ত মেনস্ট্রিম মিডিয়ায় ভারতের এই সাফল্যকে বিশেষ ভাবে প্রশংসা করা হয়েছে। দেশের পক্ষে এটি অত্যন্ত গৌরবের বিষয়।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, রাজনীতির আঙ্গিনায় খেলতে গিয়ে বিরোধীরা সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের মতো বিষয়টিকে হজম করতে পারেননি। এরা হলেন সেইসব ব্যক্তি যাঁরা মেকলীয় শিক্ষা ও ইরফান হাবিব, রোমিলা থাপার ও রামচন্দ্র গুহর মতো ইতিহাসবিদদের বিকৃত ইতিহাসের উৎকৃষ্ট ফসল। এরা ভারতের গৌরবে গৌরবান্বিত হন না, এরা ভারতের প্রাচীন গৌরবময় ইতিহাসকে অস্বীকার করেন, এরা ভারতের সাফল্যকে ছোটো করে দেখতে ভালোবাসেন, এরা রাশিয়া, চীনের সাফল্যে উৎসাহিত ও গর্বিত হন। তাই বিদেশি ভাবধারায় অনুপ্রাণিত এই দেশবিরোধী শক্তিগুলি নানা অছিলায় ভারতের চন্দ্রযান-৩ বিক্রমের এই সাফল্যকে ছোটো করে দেখাচ্ছেন। কেউ কেউ বলছেন ভারতের

মতো দেশে ৬১৫ কোটি টাকা ব্যয় করে এই যান পাঠানো বাতুলতা মাত্র। এই টাকায় নাকি অনেক হসপিটাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও গরিবদের সাহায্য করা যেত। শাসক তৃণমূলের এক এমএলএ একই মন্তব্য করেছেন। এই ব্যক্তিদের চিন্তার দৈন্য সহজেই অনুমেয় এবং এরা সকলকে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে বেঁধে রাখতে চায়। এই গণ্ডির বাইরে এঁরা বের হতে পারেন না। সুতরাং এই সমস্ত অর্বাচীন ব্যক্তিদের কাছ থেকে এর বেশি আশা করা সমীচীন নয়। এই ধরনের ব্যক্তিরা অটলবিহারী বাজপেয়ীর সময়েও পরীক্ষামূলক পোখরান বিস্ফোরণকে একই ভাবে প্রশংসা না করে নিন্দা করেছিলেন।

আমরা কেবলমাত্র বিনোদনের জন্য বহু কোটি টাকা খরচ করতে পারি, অথচ দেশের উন্নতিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে ব্যয়ের জন্য প্রশ্ন ওঠাই। দেশের তথা বিশ্বের কল্যাণে নতুন তথ্য সংগ্রহের জন্য ৬১৫ কোটি টাকা ব্যয় অন্যায় কিছু নয়। তাদের কাছে প্রশ্ন করতে চাই, তাহলে উপগ্রহের (স্যাটেলাইট) মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য টাকা খরচ কি অপচয়? এরা কি তাহলে ভারতকে গোরুর গাড়ির ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়? শিক্ষা, স্বাস্থ্য-সহ অন্য ক্ষেত্রেও যেমন উন্নতি দরকার, সেইরকম মানব কল্যাণে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে উন্নতির প্রয়োজনও রয়েছে। বলা বাহুল্য, এই চন্দ্রযান অভিযানে অন্য দেশের তুলনায় আমাদের খরচ অনেক কম হয়েছে। তথ্য সূত্রে জানা যায়, ২০১১ সালে মঙ্গলগ্রহে যান পাঠাতে আমেরিকার খরচ হয়েছিল ২০৬৩৭ কোটি টাকা। সাম্প্রতিককালে রাশিয়ার লুনা-২৫ (ধ্বংস হয়েছে) পাঠাতে খরচ হয়েছিল ১৬০০ কোটি টাকা। সুতরাং কম বাজেটে ৬১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে চন্দ্রযান-৩ পাঠানো ইসরোর বিজ্ঞানীদের অসামান্য কৃতিত্ব বলে মনে করি। সুতরাং যারা সবকিছুতেই নেগেটিভিটি দেখেন, তাদের চিন্তাধারা যে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও রাজনৈতিক অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এরা ভারতের দুঃখে দুঃখিত নয়, ভারতের সুখে আনন্দিত নয়।

আবার কিছু মাকু ভাই, ভারতের বর্তমান বিজ্ঞানীদের এই সাফল্যকে খাটো করে দেখানোর জন্য নতুন ন্যারেটিভ বাজারে ছেড়েছেন। ইসরোর প্রতিষ্ঠাতা নাকি জওহরলাল নেহরু। সুতরাং চন্দ্রযানের এই কৃতিত্ব নাকি নেহরুর। মোদীকে ও বিজ্ঞানীদের কৃতিত্বকে খাটো করতে এরা যে কত নীচে নামতে পারে, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো এই মিথ্যার বেসাতি। সত্য ঘটনা হলো, জওহরলাল নেহরু মারা গেছেন ১৯৬৪ সালে এবং বিজ্ঞানী বিক্রম সারাভাই ১৯৬৯ সালে ইসরোর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সুতরাং এই ব্যাপারে নেহরুর কৃতিত্বের কোনো প্রশ্নই উঠে না।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, নরেন্দ্র মোদীর সরকার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্যে কংগ্রেস শাসনকালের চেয়ে অনেক বেশি বাজেট বরাদ্দ করেছে যা এই ক্ষেত্রকে গুরুত্ব দেওয়ার কথা প্রমাণিত হয়। ২০১৩-১৪ অর্থবর্ষে কংগ্রেস শাসনে ইসরোর বাজেট বরাদ্দ ছিল ৩৫০০ কোটি টাকা। কিন্তু ২০২২-২৩ অর্থ বর্ষে বিজেপির শাসনকালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ১৩৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। ১৯৬৯ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ৪৫ বছরে ভারত অন্তরীক্ষে মাত্র ৩৫টি বিদেশি স্যাটেলাইট পাঠিয়েছে। কিন্তু মোদীর রাজত্বে কুশল নেতৃত্বে ২০১৪ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত মাত্র ৯ বছরে ৩৮৯টি বিদেশি স্যাটেলাইট পাঠিয়ে প্রচুর বিদেশি মুদ্রা অর্জন করেছে এবং এই অর্থ বিজ্ঞানীদের গবেষণার কাজেই যুক্ত রয়েছে।

ইসরোর বিজ্ঞানীরা চন্দ্রযান-৩ অভিযানের পূর্বে হিন্দু সংস্কৃতি অনুযায়ী শুভ কাজের সফল কামনায় তিরুপতি মন্দিরে পূজা দিয়েছিলেন। কিন্তু এই বামমনস্ক তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা রে রে করে উঠেছিলেন। বিজ্ঞানীরা মন্দিরে গিয়ে নাকি বিজ্ঞানমনস্কতা হারিয়ে কুসংস্কারে মেতেছেন। সেজন্য এরা চন্দ্রাভিযানে বিজ্ঞানীদের সাফল্যে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। এরা চন্দ্রাভিযানের ব্যর্থতার অপেক্ষায় ছিলেন। কর্ণাটকের অভিনেতা প্রকাশরাজ বিজ্ঞানীদের অপমানজনক মন্তব্য করে উপহাস করেছিলেন। আজকের এই সাফল্য এদের মুখে চুনকালি মাখিয়েছে। এদের দেখে করুণা হয়, এরা দেব-দেবীর পূজায় ভারতের সংস্কৃতি ও পরম্পরাকে অস্বীকার করতে চায়। ঈশ্বর এদের শুভবুদ্ধি প্রদান করুন এই কথাই বলা যায়।

এই প্রসঙ্গে আজকের এই সাফল্যে মোদী বিরোধীদের আচরণ দেখে মানসিক দেউলিয়ার চরম বহিঃপ্রকাশ বলেই মনে হয়েছে। মোদীর সঙ্গে পাল্লা দিতে এবং মোদীর কৃতিত্ব হ্রাস করতে আগেভাগে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বিজ্ঞানীদের অভিনন্দনের নামে নিজেকে জনসমক্ষে হাস্যকর পর্যায়ে নিয়ে গেছেন, যা বর্তমানে সোশ্যাল নেটওয়ার্কে ব্যাপক ট্রোলড্ হয়েছে। তিনি নতুন তথ্য দিলেন ইন্দিরা গান্ধীর আমলে রাকেশ রোশন নাকি চাঁদে পৌঁছেছিলেন। এক্ষেত্রে তিনি আপামর জনসাধারণের সামনে দূরদর্শনের পর্দায় দুটি ভুল তথ্য দিলেন। (১) মহাকাশচারী রাকেশ শর্মার পরিবর্তে চিত্র অভিনেতা রাকেশ রোশনের নাম বলে প্রকৃত মহাকাশচারীকে অপমান করলেন। (২) রাকেশ শর্মা মহাকাশে গিয়েছিলেন, চাঁদে নয়। মুখ্যমন্ত্রীর এই অজ্ঞতা দেশের মানুষকে বিস্মিত করেছে এবং বাঙ্গালি হিসেবে মাথা হেঁট হয়েছে বলে মনে করি। কংগ্রেস আবার নেহরুর কৃতিত্ব বেশি বলে ১৯৬২ সালের কথা উল্লেখ করেছে। এরা আসলে রাজনীতির যূপকাষ্ঠে নিজেদের বলি দিয়ে মোদীর সুনাম যাতে বৃদ্ধি না হয় তার নিজের চেষ্টা করে চলেছে।

সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে নীতীশ কুমার বলেন চন্দ্রযান সম্পর্কে তাঁর কিছু জানা নেই। দেশের একটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর মুখে এই ধরনের কথা তাঁর পদের গরিমাকে নষ্ট করেছে। আসলে এই সাফল্যকে এরা হজম করতে পারছে না, পাছে মোদীর কৃতিত্ব সামনে আসে। এরা বিজ্ঞানীদের অভিনন্দন জানাতেও ভুলে গেছেন, যেখানে বিদেশিরা অভিনন্দনে কার্পণ্য করেননি। আরজেডির প্রবক্তা শক্তি যাদব ভারতের বিজ্ঞানীদের অভিনন্দন না জানিয়ে, নাসার বিজ্ঞানীদের অভিনন্দন জানালেন। রাজস্থানের কংগ্রেসের মন্ত্রী অশোক চাঁদনা ইসরোর বিজ্ঞানীদের অভিনন্দন না জানিয়ে চন্দ্রযানের যাত্রীদের অভিনন্দন জানালেন। তার অর্থ তাঁরা কোনো খবরই রাখেন না। কংগ্রেসের রাজীব শুক্লা চন্দ্রযান ল্যান্ডিং না বলে লঞ্চিং বলে গেলেন। দিগ্বিজয় সিংহ এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বিজ্ঞানীদের মাইনের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রীকে কটাক্ষ করলেন।

প্রকৃতপক্ষে এরা মোদীর নেতৃত্বে ভারতের এই কৃতিত্বকে স্বীকার করতে পারছেন না। সেজন্য আইএনডিআইএ জোটের নেতারা কোনো না কোনো ভাবে সাফল্য থেকে অন্য দিকে দৃষ্টি ঘোরাতে চেষ্টা করে চলেছেন যা কিনা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। সত্যকে অস্বীকার করে জনগণের দৃষ্টি ঘোরানো বিরোধীদের এই কৌশল ধোপে টিকবে না। ভারতের জনগণ অনেক বিচক্ষণ, উপযুক্ত সময়ে তারা নিশ্চিত যোগ্য জবাব দেবে বলেই বিশ্বাস। ◻



মমতার তৃণমূলও চন্দ্রযান পাঠাতে পারত

শিলাদিত্য ঘোষ

আঁধার চাঁদে আমরা। চাঁদের কুমেরু দেখা যায় না পৃথিবী থেকে। অন্ধকারে ঢাকা চাঁদের ওই অংশে একটি দেশেরই পতাকা রয়েছে। তা আমাদের এর চেয়ে গর্বের আর কীই-বা হতে পারে। কৃতিত্ব কার? অবশ্যই ইসরোর। অবশ্যই বিজ্ঞানীদের নিরলস পরিশ্রমের ফসল এই সাফল্য। তাই তো গোটা দেশ অবনত হয়েছে বিজ্ঞানীদের সামনে। সেই কাজটা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও। যেই মুহূর্তে ভারত চাঁদের মাটি ছুঁয়েছে তার পরে পরেই তিনি ধন্যবাদ জানিয়ে সরাসরি বিবৃতি দিয়েছেন। তখন তিনি ব্রিকস সম্মেলনে যোগ দিতে দক্ষিণ আফ্রিকায় ছিলেন। দেশে ফিরেই আগে যান ইসরোর দপ্তরে। দূর থেকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। এবার বুকে জড়িয়ে ধরে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

এ তো একেবারেই স্বাভাবিক ঘটনা। এটাই তো করা উচিত একজন সত্যিকারের রাষ্ট্রনেতার। কিন্তু তাতে অন্য কারও বিশেষ আপত্তি না হলেও অখুশি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অনেক কথাই তিনি বলেছেন। তবে তিনি কেন এমন কথা বলছেন তা তাঁর অতীতের মন্তব্য দিয়েই বিচার করা যায়। তবে তার আগে একটা ছোটো কথা বলে রাখা দরকার। ভারতের অন্য কোনও রাজ্য পারত কি না জানা নেই, এরাজ্যের শাসক তৃণমূল কংগ্রেস চাইলেই একাধিক চন্দ্রযান পাঠাতে পারত।

বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতের মহাকাশ গবেষণায় বরাদ্দ কম। যদিও এটা মানতেই হবে যে গত কয়েক বছরে সেটা অনেকটাই বাড়িয়েছে মোদী সরকার। তা না হলে এই সাফল্য আসত না। কিন্তু তৃণমূল কী করে পারত? একটা সহজ হিসাব দিচ্ছি। চন্দ্রযান-৩ পাঠাতে ইসরোর খরচ হয়েছে ৬০০ কোটি টাকার মতো। আর তৃণমূল শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি করে যে টাকা তুলেছে তার পরিমাণ ২০০০ কোটি টাকার কাছাকাছি। এর পরে কয়লা, বালি, গোরু পাচারের টাকা ধরলে প্রতি বছরে একটি করে চন্দ্রযান পাঠানোর মতো পয়সা শুধু তৃণমূল নেতাদের দেশ বিদেশের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে আছে। বান্ধবীদের ফ্ল্যাটেও মজুত থাকতেই পারে।

থাক, এসব তুলনা না করাই ভালো। বরং, একটু অতীতের কথা বলা যাক। ২০১৯ সালে একটুর জন্য ভারতের চন্দ্রাভিযান সফল হয়নি। একেবারে শেষ মুহূর্তে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, ২০১৯ সালের ৬ সেপ্টেম্বর। গোটা দেশে ভেঙে পড়েছিল। দৃশ্যত কেঁদে ফেলেছিলেন ইসরোর তৎকালীন প্রধান কে শিবন। সেদিন সেই

ক্রন্দনরত বিজ্ঞানীকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন কে? প্রধানমন্ত্রী মোদী। বলেছিলেন, এবার হয়নি, কিন্তু আগামীতে হবেই।

চন্দ্রযান-৩-এর সাফল্য কোনও ভাবেই মোদীকে দিতে চাই না। সাফল্য মহাকাশ বিজ্ঞানীদের। কিন্তু 'ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে' বলা দেশের অভিভাবকের কৃতিত্ব কি একেবার অস্বীকার করা যায়? প্রশ্ন আরও আছে। চন্দ্রযান-৩ যাতে সাফল্য পায় তার জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন আগেই। পরেও অভিনন্দন জানিয়েছেন। আগে থেকেই লিখে রেখেছিলেন। সন্ধায় ৬টা ৪ মিনিটে চাঁদ ছোঁয় বিক্রম। আর তার ৩০ সেকেন্ডের মধ্যে মমতা টুইট করে দেন। কিন্তু একটা কথা মনে হয়েছে, যে ভাবে তিনি ঈর্ষা প্রকাশ করছেন তাতে কি এমনটা মনে হয় না যে, সফল না হলেই তিনি খুশি হতেন? হয় তো আরও একটা বার্তা তিনি লিখেই রেখেছিলেন। অভিযান ব্যর্থ হলেই তিনি সেটি টুইট করে দিতেন।

কেন এমন বলছি? মনে করাতে চাই চন্দ্রযান-২-এর অবতরণের দিনটা। ২০১৯ সালের ৬ সেপ্টেম্বর। সেদিন রাতেই চাঁদে পৌঁছানোর কথা ভারতের। দুপুরে রাজ্য বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি বলেছিলেন, 'দেশে আর্থিক বিপর্যের মধ্যে মানুষের দৃষ্টি অন্য দিকে ঘোরানোর জন্য চন্দ্রযান-২-এর প্রচার চলছে।' আলোচনা চলছিল এনআরসি নিয়ে। তার মধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এখন যাঁরা লাফালাফি করছেন, সেই বিজেপির নেতাদের থাকার জন্য চাঁদে জমি কিনে বহুতল বানিয়ে দিন। ওখানে গিয়ে থাকবেন ওঁরা।' এটা কিন্তু অস্বীকার করা যাবে না। বিধানসভার রেকর্ড বুকে রয়ে গিয়েছে। আর অভিযান পুরোপুরি সফল না হওয়ার পরে অনেকবারই জনসভা থেকে 'কেমন তোমরা তো মুখ থুবড়ে পড়লে', 'ধপাস হয়ে গেলে' ইত্যাদি বলেছেন তিনি।

তা হলে তো তিনি এবারও বলতেন। কারণ, উনি মনে করছেন ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো মহাকাশ গবেষণাতেও দেশের সাফল্য মোদীর পালে হাওয়া দিতে পারে। সুতরাং, চন্দ্রযান-৩-এর সাফল্য তাঁকে খুশি নাই করতে পারে। এখন তো আবার তিনি বলে বেড়াচ্ছেন গোটা পৃথিবী চন্দ্রযানের ল্যান্ডিং দেখতে পেলেও তিনি নাকি পাননি। তাঁর দলের অনেকেই পাননি। আসলে তিনি রাগ দেখাতে চাইছেন যে, মোদীকে কেন তার পরেই টিভিতে দেখানো হয়েছে। কেন হবে না? ইসরোকে মানসিক জোর তো তিনিই দিয়েছিলেন? মমতা 'ধপাস' বলে ব্যঙ্গ করেছিলেন।

আসলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটা জিনিস স্পষ্ট বুঝতে পেরে গিয়েছেন যে, নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারত এবার এক অন্য উচ্চতায় পৌঁছে গেল। উনি চান বা না চান দেশ এটা মনে রাখবে। গোটা বিশ্বও। চাঁদে যাওয়ার প্রথম সাফল্য আমেরিকা পায় ১৯৬৯ সালের ২০ জুলাই। নিল আর্মস্ট্রং এবং এডউইন অলড্রিন চাঁদে গিয়ে ফিরে আসেন। আর্মস্ট্রংকে বলা হয়, প্রথম চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণকারী মহাকাশচারী। চাঁদে নেমে আর্মস্ট্রং বলেন, 'আ স্মল স্টেপ ফর আ ম্যান, আ জায়ান্ট লিপ ফর ম্যানকাইন্ড।' ঠিক এই কথাটাই ভারতের প্রধানমন্ত্রীও বলেছেন। জানিয়েছেন, ভারতের এই সাফল্য গোটা বিশ্বের কল্যাণের কাজে লাগবে।

আর মহাকাশ নিয়ে পৃথিবীর শক্তিধর দেশগুলির মধ্যে লড়াই তো নতুন নয়। রাশিয়া, আমেরিকা, চীনের সেই লড়াইয়ে ভারত নামেনি। বরং আজকের ভারত জয় দিয়ে বাকিদের জয় করতে চেয়েছে। কাউকে ভয় দেখাতে নয় এই জয়। বুঝিয়ে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু রাজনৈতিক ভয় পাচ্ছেন মমতা।

মহাকাশ গবেষণা রাজনৈতিক জয় পরাজয়ের থেকেও বড়ো। তবে মিল রয়েছে। এখানেও ভুল থেকে শিক্ষা নিতে হয়। আবার এক দেশের ভুল থেকে অন্য দেশ শিক্ষা নেয়। একের সাফল্য থেকেও অন্য দেশ শিক্ষা নেয়। কারণ, জ্ঞান আন্তর্জাতিক। আর ভারত সেই আদর্শেই বিশ্বাস রাখে। তাই আগামীদিনে ভারতের এই সাফল্যে ভর করে অনেক দেশই মহাকাশ বিজয়ের স্বপ্ন দেখবে। সফলও হবে। যাতে উপকার হবে আপামর মানব সভ্যতার। কোনও একটি দেশ বা একটি অংশের নয়। সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর সঙ্গে ইতিহাসের কথা জানলেই এটা স্পষ্ট হবে।

এবার রাশিয়াও লুনা-২৫ মহাকাশযান পাঠিয়েছিল। অনেক বেশি খরচের সামর্থ্য রয়েছে রাশিয়ার। ভারতের থেকে অনেক অনেক বেশি। তবু লুনা সাফল্য পায়নি। চন্দ্রযান-৩-এর পাশাপাশি ওই মহাকাশযানও ছিল চাঁদের কুমেরুতে যাওয়ার প্রতিযোগিতায়। চন্দ্রযান-৩ যেখানে মহাকাশে পাঠানো হয়েছিল ১৪ জুলাই, সেখানে লুনা-২৫ পাঠানো হয়েছিল ১০ আগস্ট। দশ দিনের মধ্যে চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে নামার কথা ছিল লুনা-২৫' এর। কিন্তু সে মহাকাশযান অবতরণকালে চাঁদের বুকে মুখ থুবড়ে পড়ে। তা বলে কি রাশিয়া পারেনি আমরা পেরেছি বলে আনন্দ করতে হবে? মোটেও নয়। মহাকাশযাত্রায় ব্যর্থতা কোনও বড়ো বিষয় নয়। তা থেকে শেখাটাই মূল। যে অ্যাপোলো প্রকল্পের একাদশ যান চন্দ্রাবতরণ করে, সেই প্রকল্পের প্রথম যান ১৯৬৭ সালে ব্যর্থ হয়। ওই ব্যর্থ প্রকল্পে তিনজন মহাকাশচারীই মারা যান। ১৯৮৬ সালের চ্যালেঞ্জার দুর্ঘটনা তো বিখ্যাত। সে দুর্ঘটনার তদন্তের যে কমিটি গঠিত হয়, তার সদস্য ছিলেন নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী রিচার্ড ফিলিপ ফাইনম্যান। তিনি দেখেন, অত্যধিক ঠাণ্ডায় একটা যন্ত্রাংশ নষ্ট হওয়ায় ওই দুর্ঘটনা। এমন যে হতে পারে তা ভাবেননি নাসা-র বিজ্ঞানীরা। সুতরাং, নানা কারণে মহাকাশ প্রকল্প ব্যর্থ হতে পারে। চন্দ্রযান-৩-এর চার বছর আগে ভারতের চন্দ্রযান-২ এর ব্যর্থতাও একই রকম। যা নিয়ে মমতা ব্যঙ্গ করেছেন। প্রধান কথা, এবারের সাফল্যের পরে ইসরো শ্রীধর পানিকর সোমনাথ বলেছেন, চন্দ্রযান-২ কেন চাঁদের মাটিতে ধুবড়ে পড়েছিল, সেটা বুঝতে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের এক বছর সময় সময় লাগে। বাকি তিন বছর চন্দ্রযান-৩-এর প্রস্তুতি। ভুল করা কথা নয়, ভুল থেকে শিক্ষা নেওয়াটাই বড়ো কথা। ভারতীয় বিজ্ঞানীরা আগের বারের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়েছেন এবং সম্পূর্ণ সফল হয়েছেন। একই কথা

মোদীও বলেছেন। তবে এটা ভাবার কোনও কারণ নেই যে পানিকর মোদীর সুরে সুর মিলিয়েছেন। আসলে যা সত্য, তা এক। তেমনই একটা সত্য হচ্ছে ইসরোর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৯৬২ সালে। তখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন জওহরলাল নেহরু। সেই কৃতিত্ব কম নয়। আবার এটাও সত্য যে, এখনও পর্যন্ত ইসরোর ৮৯টি স্যাটেলাইট মিশনের মধ্যে ৪৭টিই হয়েছে মোদী সরকারের আমলে।

> এখন তো আবার তিনি বলে বেড়াচ্ছেন গোটা পৃথিবী চন্দ্রযানের ল্যান্ডিং দেখতে পেলেও তিনি নাকি পাননি। তাঁর দলের অনেকেই পাননি।



যেমন এটাও সত্য যে লোকসভা নির্বাচনের আগে ভারতের সাফল্যকে বিজেপির সাফল্য মনে করছেন মমতা। তাই তো তিনি বিষয়টার মধ্যে বাঙ্গালি আবেগ ঢোকানোর চেষ্টা শুরু করে দিয়েছেন। চন্দ্রযান-৩-এর সফল প্রকল্পে শামিল বাঙ্গালি বিজ্ঞানীদের সংবর্ধনা দিতে চান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আদতে বাঙ্গলার ভূমিপুত্র এমন যে বিজ্ঞানীরা ওই প্রকল্পের অংশ, তাঁদের প্রত্যেককে চিঠি পাঠিয়ে কৃতিত্বের জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছেন তিনি। উদ্যোগ মন্দ নয়। কিন্তু তাঁর দেওয়া সম্মান বা পুরস্কারের গায়ে এতটাই রাজনীতি লেগে থাকে যে তা অসম্মান হয়ে ওঠে। উনি তোষামুদে, পারিষদবর্গ চান। আর সেটাই আপত্তির।

আর সেটা গিয়ে ভুলভাল বকেন। যে বিজ্ঞানীদের সাফল্যকে তিনি সম্মান দিতে চান বলে জানাচ্ছেন তাঁদেরকেই ছোটো করে চলেছেন। তিনি নির্দ্বিধায় মোদী সরকারের কৃতিত্বকে খাটো করতে মহাকাশচারী রাকেশ শর্মাকে অভিনেতা রাকেশ রোশন বানিয়ে দিচ্ছেন। মহাকাশ নয়, চাঁদে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। কখনও তাল হারিয়ে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকেও চাঁদে পাঠাচ্ছেন। আসলে সত্য কখনও ভুল বলা যায় না। আর অসত্য নিজেই তার বয়ান বদল করে নেয়। মমতার ক্ষেত্রেও সেটাই হচ্ছে। তিনি যদি সত্যিই রাকেশ শর্মাকে সম্মান জানাতে চাইতেন তবে একটু পড়াশোনা করে নিতে পারতেন। সবাই সব জানবেন এটা ভাবার কোনও কারণ নেই। কিন্তু অন্যকে জানানোর আগে সঠিকটা জেনে নেওয়াই সুনাগরিকের কর্তব্য। সেটা কখনোই করেন না মমতা। তিনি সম্মান দেওয়ার অছিলায় অসম্মান করতে চান। সেটা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানের শব্দ বদল করে। আবার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সংগীতকে রবীন্দ্রনাথের বলে চালিয়ে। প্রাথমিকের পড়ুয়াদের কাছেও তিনি হাস্যকর হয়ে গিয়েছেন। তবে তাতে মমতার কিছু যায় আসে না। তিনি অতীতেও অনেক মহাপুরুষকে নীচে নামাতে চেয়েছেন। পারেননি হয়তো কিন্তু চেষ্টা ছাড়েননি। আসলে মমতা নাসার মতো, ইসরোর মতো ভুল থেকে শিক্ষা নিতে চান না। ভুলের পালটা ভুলেই বিশ্বাস করেন।

বিতর্ক তৈরির চেষ্টাও তাঁর কম নয়। চাঁদের মাটিতে যে জায়গায় ভারতের তৃতীয় চন্দ্রযানটি অবতরণ করেছে, তার নাম এখন থেকে 'শিব শক্তি'। ইসরোর দপ্তরে গিয়ে এই নামকরণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'যেখানে চার বছর আগে চন্দ্রযান-২ ভেঙে পড়েছিল, তার নাম হবে 'তেরঙা'। এই স্থানটি মনে করাবে, ব্যর্থতাই শেষ নয়। তার পরেও সাফল্যের পথ খোলা থাকে। ২৩ আগস্ট চন্দ্রযান-৩-এর অবতরণের দিনটিকে এখন থেকে জাতীয় মহাকাশ দিবস হিসেবে পালন করা হবে বলেও ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। এখানে 'শিব শক্তি' নামকরণ কেন তা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হচ্ছে। আসলে সংবাদমাধ্যমের একাংশ নামটিকে 'শিবশক্তি' বানিয়ে দিয়েছেন। যার অর্থ দাঁড়ায় শিবের শক্তি। তাতে হিন্দুত্বের গন্ধ পাচ্ছেন সমাজের সেই অংশ যাঁরা মমতার পারিষদ। ভোট হারানোর ভয়ে তাঁদের দিদি কিছু না বললেও তাঁরা বলছেন। প্রথমে হিন্দুর এই দেশের সাফল্যে হিন্দু দেবতার নাম দেওয়া হলেও তা নিয়ে বিতর্ক থাকা উচিত নয়। তবে এখন 'শিব শক্তি' বলে প্রধানমন্ত্রী একই সঙ্গে 'পুরুষ' ও 'নারী' উভয় শক্তির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে চেয়েছেন। সত্য জেনেও না জানার ভান যাঁরা করে তাঁদের তো আর এসব শেখানো যাবে না। তাঁরা কিন্তু মমতা যখন সরণিকে ধরণী বানিয়ে দেন তখন চুপ থাকেন। 'আহা বেশ বেশ বেশ' বলে তোল্লা দেন। আবার 'সিধু-কানু-ডহরবাবু' (ডহর মানেও রাস্তা) বলেন তখনও তাই করেন।

হাতে কিছু নেই বলে আগামী লোকসভা নির্বাচনে বাঙ্গালি আবেগ কাজে লাগাতে চান মমতা। তাই পয়লা বৈশাখকে 'রাজ্য দিবস' বানাতে মরিয়া। লোকদেখানো মতামত জানার বৈঠক ডেকে তোষামুদেদের দিয়ে বলিয়েও নিয়েছেন। আবার তিনি রবীন্দ্রনাথের লেখা 'বাংলার মাটি, বাংলার জল' গানটির কথা পালটে দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন। কথাটি তাঁর মুখ থেকে পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই পারিষদবর্গ এই প্রস্তাবে সায় দিয়েছেন। বাঙ্গালি মেনে নেবে কি না জানা নেই কিন্তু দিদি চেয়েছেন বলে কথা! বাঙ্গালি আবেগকে ভোটের বাক্সে টানতেই তিনি বিধানসভায় প্রস্তাব এনে ইসরোকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। বাঙ্গালি বিজ্ঞানীদের সম্মান জানাতে চান। কিন্তু এটাকে কি আদৌ 'সম্মান' বলে? □

বিজ্ঞানমনস্কতার অর্থ নিজের ধর্ম-সংস্কৃতিকে পরিত্যাগ করা নয়

দিগন্ত চক্রবর্তী

চন্দ্রপৃষ্ঠে ভারতের মহাকাশযানের সফলভাবে অবতরণ করার পর অসংখ্য দেশ এবং বেসরকারি সংস্থাগুলির মধ্যে ভারতে বিনিয়োগের জন্য প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। সম্প্রতি রাশিয়ার লুনা-২৫ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। আবার গত এপ্রিলে একটি জাপানি কোম্পানির মহাকাশযান চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণের আগে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ২০১৯ সালে ইজরায়েলের একটি চন্দ্রযানও অনুরূপভাবে ল্যান্ডিঙের আগেই ধ্বংস হয়ে যায়। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, বিশ্বের কোনো দেশই এর আগে চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে ল্যান্ড করার চেষ্টা করেনি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও রাশিয়া চাঁদের নিরক্ষীয় অঞ্চলে সফট ল্যান্ডিং করার চেষ্টা করলেও চাঁদের দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে এই চেষ্টা করা কঠিন বলে তারা মনে করত। আর সেই অসম্ভবকেই সম্ভব করে দেখিয়েছে ভারত।



মহাকাশ বিজ্ঞানে ভারতের এই কৃতিত্ব যদি অতি সাম্প্রতিক বলা হয় তাহলে ভুল হবে। ২০১৫ সালে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বক্তৃতা দেওয়ার সময় ইসরোর প্রাক্তন চেয়ারম্যান জি মাধবন নায়ার বলেন বেদের কিছু শ্লোক রয়েছে যার থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে চাঁদে জল আছে। কিন্তু কেউই তা বিশ্বাস করেনি। আমাদের চন্দ্রযান মিশনের মাধ্যমে আমরা এই সত্যটি প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছি এবং আমরাই প্রথম এটি খুঁজে পেয়েছি। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন চন্দ্রযানের জন্য আর্যভট্টের সমীকরণও ব্যবহৃত হয়েছে।

'বেদেই নিহিত বিজ্ঞানের মূল কথা। সেখান থেকেই আধুনিক বিজ্ঞানের উৎপত্তি!' বেশ কিছুদিন আগে এই কথা জানিয়েছিলেন ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো)-র চেয়ারম্যান এস সোমনাথ। তাৎপর্যপূর্ণভাবে চন্দ্রযান-৩ মহাকাশে পাঠানোর আগে ইসরোর বৈজ্ঞানিকদের দল মন্দিরে গিয়ে পুজো দেন। চন্দ্রযান-৩-এর একটি ছোটো রেপ্লিকা মডেল নিয়ে তাঁরা পুজো দিতে যান। সেই নিয়ে যথেষ্ট কটূক্তির তির এসেছিল নিজেদের অতি আধুনিক, বিজ্ঞানমনস্ক মনে করা কিন্তু আদতে বিকৃত মানসিকতা সম্পন্ন তথাকথিত মুক্তমনাপন্থীদের কাছ থেকে। ভারতীয় বিজ্ঞানীদের সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাভাব দেখে তারা অত্যন্ত আতঙ্কিত হয়েছিলেন ভারতে বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ নিয়ে। আশা করি, চন্দ্রযান-৩-এর সফল অবতরণের পর তারা নিশ্চিন্ত হয়েছেন! ভারতীয় বিজ্ঞানীরা আজ প্রমাণ করে দিলেন আধুনিকতা মানে নিজের সংস্কৃতিকে ভুলে যাওয়া নয়, বিজ্ঞানমনস্কতা মানে নিজের ধর্ম-সংস্কৃতি ত্যাগ করা নয়।

ভারতীয়দের পশ্চিমি বিশ্বের প্রতি অন্ধভক্তির বেশ কিছু কারণ রয়েছে। দীর্ঘ হাজার বছর ধরে ভারতবর্ষ বিদেশি শক্তির কাছে পরাধীন ছিল। এই সময়ে বিভিন্ন দেশ ও গোষ্ঠী ভারতের উপর আক্রমণ হেনেছে। তারা যখন উপলব্ধি করেছিল যে আক্রমণ করে ভারতকে সম্পূর্ণরূপে শেষ করা সম্ভব নয় তখন তারা আঘাত হানল ভারতের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ওপর। আমরা জানি কীভাবে নালন্দা, তক্ষশীলার মতো বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ধ্বংস করা হয়েছিল। জানা যায় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে লাইব্রেরিতে এত পুঁথি ছিল যে তা পুড়তে তিন মাসেরও বেশি সময় লেগেছিল। সেই অমূল্য গ্রন্থে, পুঁথিগুলি থাকলে না জানি আমরা আরও কত দ্রুত সাফল্যের শিখরে পৌঁছতে পারতাম। দুঃখের বিষয়, বিদেশি শক্তি বহুদিন হলো ভারত থেকে বিতাড়িত হয়েছে ঠিকই কিন্তু আমাদের মধ্যে এখনও দাসসুলভ ভাব রয়ে গেছে। এখনও আমরা বিদেশিদের পরানুকরণ করে গর্বানুভব করি। ভারতের দীর্ঘদিন ধরে পরাধীন থাকার কারণ যে এগুলোই স্বামীজী তাঁর স্বদেশমন্ত্রে এটা সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। ভারতের পরাধীনতার কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন, পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরামুখাপেক্ষা।

কিন্তু মজার বিষয়, লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে পশ্চিমি বিশ্ব কিন্তু আমাদের সনাতন হিন্দু ধর্মের ধর্মগ্রন্থগুলিকে জ্ঞানের ভাণ্ডার হিসেবে দেখে এবং সেগুলিতে যা লেখা আছে তা বিশ্বাসও করে। শুধু বিশ্বাস করে বললে ভুল হবে, কঠিন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে তারা এগুলিকে সঠিক প্রমাণ করছেন এবং বিশ্বের সামনে তুলে ধরছেন। উদাহরণস্বরূপ, অথর্ববেদে স্পষ্টভাবে বলা আছে যে সূর্যলোক একটি সরল রেখায় ভ্রমণ করে। পশ্চিমের আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানীরা এই যুক্তি যে সঠিক তা নিশ্চিত করেছেন। জানা যায়, নাসার কাছে আমাদের অনেক ধর্মগ্রন্থ রয়েছে এবং তারা আমাদের সেই ধর্মগ্রন্থগুলির পাঠোদ্ধার করার জন্য সংস্কৃতে দক্ষ বিজ্ঞানীদের নিয়োগ করেছেন। অপরদিকে আমরা বেশিরভাগই সংস্কৃতের সঙ্গে পরিচিত না হওয়ার ফলে আমাদের সম্পদগুলি আমাদের কাছেই বিস্মৃত। বর্তমানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির শীর্ষে থাকা দেশগুলোর মধ্যে জার্মানি অন্যতম। তারাও তাদের শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সংস্কৃত শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। সংস্কৃতের প্রতি জার্মান দার্শনিক এবং বিজ্ঞানীদের আগ্রহ সুপরিচিত। তারা এখন আমাদের ধর্মগ্রন্থগুলির মধ্যে লুকিয়ে থাকা অমূল্য তত্ত্বগুলিকে উদ্ধারের জন্য উদ্যত হয়েছেন। যে কোনো সাফল্যই মানুষকে অনেকটাই এগিয়ে দেয়। চন্দ্রযান-৩-এর এই সাফল্য ভারতীয় বিজ্ঞানীদের আরও বেশি উৎসাহিত করবে। এই সাফল্য ভারতের বৈজ্ঞানিককুলকে কয়েকশো কদম এগিয়ে দেবে এবং আগামীদিনে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও ভারত সারা বিশ্বকে পথ দেখাবে। □

দত্তপুকুরের বিস্ফোরণ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল পশ্চিমবঙ্গ পশ্চিমবঙ্গেই আছে

মণীন্দ্রনাথ সাহা

আবার সেই বিস্ফোরণ। 'এগিয়ে বাংলা'র ঐতিহ্য অনুযায়ীই হয়েছে এই বিস্ফোরণ। এক লহমায় দত্তপুকুরের নীলগঞ্জের মোছপোলের পশ্চিমপাড়া এলাকা যেন মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছে। জানা গিয়েছে সেখানকার বাতাসে শুধুই যেন বারুদ আর মানুষ ঝলসানোর গন্ধ। রাতারাতি এই অখ্যাত গ্রামের নাম রাজ্যবাসী জেনে গিয়েছে। বিস্ফোরণের পর চব্বিশঘণ্টা কেটে গেলেও নাকি নীলগঞ্জ জুড়ে থমথমে অবস্থা রয়েছে।

বিস্ফোরণের দু' দিন পরেও দেখা গেছে, এদিক ওদিক ছড়িয়ে- ছিটিয়ে রয়েছে মৃতদেহের ছিন্নভিন্ন অংশ। বিস্ফোরণস্থলের পিছনের দিকের অংশ থেকে কাটামুণ্ডু উদ্ধার হয়েছে। অন্যত্র পাওয়া গিয়েছে ঝলসে যাওয়া হাত ও হাতের আঙুল। বিস্ফোরণস্থলের কাছে একটি বাড়ির চালের টালি ভেঙে ভিতরে এসে পড়েছে একটি হাত। বাড়ির বউ আরিফা বিবি সেটি দেখেই শিউরে উঠেন। তাঁর চিৎকারে পরিবারের সবাই সেখানে এসে দেখেন, মানুষের হাত পড়ে রয়েছে। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে পরিবারে। পরে পুলিশ এসে সেটা নিয়ে যায়। এছাড়া ঘটনাস্থল থেকে প্রায় আধ কিলোমিটার দূরে তিনটি দেহাংশ উদ্ধার হয়েছে। এক জায়গায় পড়ে রয়েছে পায়ের পাতা, এক জায়গায় ডান হাতের কনুই থেকে কাটা অংশ, পুকুরের মধ্যে ভাসছে আরেকটা দেহাংশ। বিস্ফোরণে পাকাবাড়ি ভেঙে পড়ে মাটিতে মিশে গিয়েছে। কারও বাড়ির চাল উড়ে গিয়েছে। একটু দূরের বাড়িগুলির জানালার কাচ পর্যন্ত ভেঙে পড়েছে। এতেই অনুমান করা যায় বিস্ফোরণের তীব্রতা কতটা।

বিস্ফোরণস্থলের ছবি টিভির পর্দায় দেখার সময় দেখা গেছে এক জায়গায় অনেক স্টোনচিপস জড়ো করা ছিল। প্রশ্ন উঠেছে, বাজি তৈরি করতে স্টোনচিপস লাগে নাকি? তাহলে কি বোমা তৈরি হতো? আরও জানা গিয়েছে, বাজি ব্যবসায়ী সমিতির সদস্যরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে পটাশিয়াম ক্লোরাইড পাওয়া গিয়েছে বলে দাবি করেছে। এতেই মারাত্মক বোমা তৈরির অভিযোগ জোরালো হচ্ছে। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ৯ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। আহত অনেক। শোনা যাচ্ছে বাজি কারখানার মালিক ও তার ছেলেও মারা গিয়েছে। এরাজ্যে শুধু যে দত্তপুকুরে বিস্ফোরণ হলো তা কিন্তু নয়। ইতিপূর্বে এবছরে ১৬ মে বিস্ফোরণে মেদিনীপুরের এগরা খাদিকুলে মৃত্যু হয়েছে ১১ জনের। ২১ মে বজবজে মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের। ৪ জুলাই মুগবেড়িয়ায় বিস্ফোরণ হয়েছে। ৬ জুলাই বেলডাঙ্গা। ২৭ আগস্ট দত্তপুকুরে হলো। এছাড়াও ২০২৩-এর আগে বিস্ফোরণ ঘটেছে খাগড়াগড়, নোদাখালি, ইংরেজবাজার, মুর্শিদাবাদ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তর ২৪ পরগনার নৈহাটি, নাগের বাজার প্রভৃতি বিভিন্ন এলাকায়।



স্বভাবতই সাধারণ মানুষ প্রশ্ন তুলেছেন, তৃণমূল নেতা ও প্রশাসনের মদতে রাজ্যজুড়ে চলছে বোমা-বারুদের অবৈধ কারবার। এত মানুষের মৃত্যুর পরেও মুখ্যমন্ত্রী বোমা-বারুদের কারখানা রুখতে ব্যর্থ হচ্ছেন কেন? এই ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রীকে একযোগে আক্রমণ করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ও রাজ্যসভাপতি সুকান্ত মজুমদার। এই ঘটনা নিয়ে এনআইএ তদন্ত চেয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে চিঠি দিয়েছেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। বিজেপি অভিযোগ করেছে, তৃণমূলের মদতেই এতবড় ঘটনা ঘটেছে। আবার তৃণমূল দাবি করেছে, এই ঘটনায় আইএসএফের লোকজন জড়িত। তবে স্থানীয় মানুষের অভিযোগের তির রয়েছে স্থানীয় তৃণমূল বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী রথীন ঘোষের দিকে।

কী আশ্চর্য, ওইদিন দত্তপুকুরে যেমন বিস্ফোরণ হয়েছে তেমনি মালদার চাঁচল ২নং ব্লকের চন্দ্রপাড়া গ্রামপঞ্চায়েতের তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যা মুন্তরা খাতুনের দেওর নাসের হোসেনের বাড়িতে মজুতরাখা বোমা রবিবার দুপুরে হঠাৎ ফেটে যায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে দত্তপুকুরে যে বাড়িতে এদিন বিস্ফোরণ ঘটেছে তার মালিককে আগে তারা সতর্ক করেছিলেন। কিন্তু তাদের কথায় কর্ণপাত না করে বাইরে থেকে লোক নিয়ে এসে বেআইনি বাজি তৈরি করাতেন বাড়ির মালিক।

এটা তো ঠিক, রাজ্যে যে কোনো জেলার যে কোনো স্থানে তৃণমূলের নেতা-বিধায়ক-মন্ত্রীদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সমর্থনে এবং পুলিশ ও প্রশাসনের এক শ্রেণীর কর্তাদের সহযোগিতাই তৃণমূল পোষিত দুষ্কৃতীরা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গকে বারুদের স্তূপে পরিণত করেছে। অনেকেই মন্তব্য করছেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দপ্তর নিজের হাতে রেখেও এ বিষয়ে উদাসীন। যখন কোনো একটা অঘটন ঘটে তখন কিছুদিনের জন্য হম্বিতম্বি করে আবার তিনি চুপ হয়ে যান। তাঁর প্রধান কাজ বিজেপিমুক্ত পশ্চিমবঙ্গ প্রতিষ্ঠা করা। আর সেই লক্ষ্যে রাজ্যে অপরাধীদের দৌরাত্ম্যও উপেক্ষা করে চলেছেন। তিনি হয়তো ধারণা করতে পারেননি যে বিজেপিকে ঠেকাতে দুধেল গোরুদের অপরাধকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে গিয়েই এতগুলো দুধেল গোরুর প্রাণ যাবে। সাধারণ মানুষ তাঁর কাছে আশা করে, তিনি যেন ধর্মমত নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রাণ রক্ষার জন্য রাজ্য থেকে অপরাধীদের কঠোর শাস্তি দিয়ে মানুষের শান্তিতে বসবাসের নিশ্চয়তা দান করেন। □

মণিপুর নিয়ে কংগ্রেস এত সক্রিয় কেন?

সাধন কুমার পাল

মণিপুরের অশান্তির পেছনে কোন শক্তি সক্রিয়? বিরোধীদলগুলি এই ইস্যুতে কেন এত সক্রিয়? কেন মণিপুর দীর্ঘদিন ধরে জ্বলছে? কংগ্রেস এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দল কেন এই বিষয়ে অতি সক্রিয়? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পেতে একটি তদন্তমূলক প্রতিবেদন।

খুব কম লোকই জানে যে মণিপুর সামরিক শাসনে থাকা মায়ানমারের সঙ্গে প্রায় ৪০০ কিলোমিটার বেড়াহীন সীমান্ত ভাগ করে নিয়েছে। এই সীমান্তে একটি 'ফ্রি মুভমেন্ট রেজিম' রয়েছে যা উভয় দেশের উপজাতিদের (কুকিদের) কোনো সীমাবদ্ধতা বা ভিসা ছাড়াই সীমান্তের ভিতরে ১৬ কিলোমিটার পর্যন্ত যাতায়াত করতে দেয়।

এই এলাকাটি সবচেয়ে বড়ো মাদক উৎপাদনকারী এলাকা 'দ্য গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গেল'-এর অধীনে আসে। এই সীমান্ত পার্বত্য এলাকার কুকি উপজাতিরা বেশিরভাগ আফিম চাষে জড়িত।

আপনারা অনেকেই কলম্বিয়ান ড্রাগ লর্ড পাবলো এসকোবার সম্পর্কে শুনেছেন, কারণ নেটফ্লিক্সে তার উপর একটি ওয়েব সিরিজ রয়েছে। যখন সরকারি সংস্থা তার বিরুদ্ধে কাজ করতে শুরু করেছিল তিনি পুরো কলম্বিয়াকে জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন, মণিপুর এখন যেভাবে জ্বলছে। কিন্তু আপনি কি জানেন যে সোরোস কলম্বিয়ার মাদক ব্যবসা থেকে প্রচুর লাভ করেছেন? হ্যাঁ, আপনি এটা ঠিক শুনেছেন, ৯০-এর দশকের গোড়ার দিকে, সোরোস কলম্বিয়ান ড্রাগ মানি থেকে বিপুল অর্থ লাভ করেছিলেন। কীভাবে?

এক্সিকিউটিভ ইন্টেলিজেন্স রিভিউ অনুসারে সোরোস সরাসরি এবং কলম্বিয়াতে তার ঘনিষ্ঠভাবে চিহ্নিত গিলিনস্কি পরিবারের সঙ্গে বিনিয়োগ করে ড্রাগ ফাইন্যান্সিং থেকে অর্থ উপার্জন করেছেন।



রাহুল গান্ধী ও জর্জ সোরোস

যখন এই তথ্যটি যাচাই করতে যাচ্ছি তখন Forbs-এর একটা রিপোর্ট দেখা গেল যাতে গিলিনস্কি বলেছেন যে তার কাছে একটি ব্যাংক কেনার জন্য কোনো টাকা নেই কিন্তু তিনি এটি কেনার জন্য জর্জ সোরোস এবং অন্য ১০০ জনের অর্থ ব্যবহার করেছেন।

এখন মণিপুর ও বার্মার দিকে ফিরে আসা যাক। ১৯৯৪ সালে সোরোস বার্মার সামরিক সরকারকে প্রতিস্থাপন করতে এবং তার পুতুল সরকার স্থাপনের জন্য 'বার্মা প্রকল্প' শুরু করেন।

সোরোস 'বার্মা প্রজেক্ট'-এর মাধ্যমে কুকি সম্প্রদায় এবং তাদের সংগঠনকে প্রচুর অর্থায়ন শুরু করেছেন। তিনি ছাত্র ইউনিয়ন থেকে বৃত্তি, সাংস্কৃতিক দল থেকে এনজিওতে তহবিল দিতে শুরু করেন। কিন্তু কুকিরা কেন?

একই বছরে ১৯৯৪ সালে সোরোস একটি থিঙ্ক ট্যাঙ্ক এফডিএল-এপি গঠন করেন যাতে সোনিয়া গান্ধী সহ-সভাপতি ছিলেন এবং বার্মিজ রাজনীতিবিদ অং সান সু চি সিনিয়র উপদেষ্টা। এই গোষ্ঠীর অগ্রাধিকার ছিল সেখানে পুতুল সরকার গঠন করা।

অং সান সু চি সোরোসের খুব কাছের এবং সেই কারণেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাকে বার্মার প্রধানমন্ত্রী করতে চায়।

সোরোস একটি ড্রাগ পলিসি অ্যালায়েন্সও শুরু করেছেন। এর অর্থায়নের সাহায্যে তিনি সরকারি নীতি পরিবর্তন করতে চান। তিনি মাদককে বৈধ করতে চান। তিনি মাদক সংক্রান্ত অপরাধকে অপরাধমুক্ত করতে চান। সেই তহবিল দিয়ে সোরোস বার্মা-সহ সারা বিশ্বে মানবাধিকারের নামে মাদক অপরাধীদের সমর্থন করতে সহায়তা করছেন।

২০১৪ সালে, শ্রীলঙ্কা ড্রাগ কার্টেলের বিরুদ্ধে ক্র্যাক ডাউন শুরু করে এবং ড্রাগ লর্ড এবং পাচারকারীদের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করে, সোরোস শ্রীলঙ্কাকে সতর্ক করেছে যে এটি করে তারা বিপর্যয়ের সঙ্গে খেলছে। এবং সোরোস তা সঠিক প্রমাণ করেছেন! তখন শ্রীলঙ্কা জ্বলছিল। একইভাবে ২০১৮ সাল থেকে মণিপুর সরকারও মাদকের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ শুরু করেছে। মণিপুর সরকার ১৮,৬৬৪ একর পপি চাষের জমি ধ্বংস করেছে এবং ৯৬৩ জনেরও বেশি মাদক পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করেছে। ফলাফল? কলম্বিয়া ও শ্রীলঙ্কার মতো মণিপুরও জ্বলছে।

সোনিয়া গান্ধী নিজে যখন সোরোসের অর্থায়নে থিঙ্ক ট্যাঙ্কে কাজ করছিলেন এবং সোরোস যদি ফরি নেহরুর বন্ধু হন, তাহলে মনমোহন সিংহের মেয়ে যখন সোরোসের হয়ে কাজ করেন তখন আমরা অবাক হব কেন? সোনিয়া গান্ধীর প্রাক্তন সাহায্যকারী হর্ষ মাণ্ডার যখন সোরোসের পক্ষে কাজ করেন তখন কেন আমাদের অবাক হতে হবে?

সোরোসের ওপেন সোসাইটি ফাউন্ডেশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট সলিল শেট্টি যখন রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়ো পিআর যাত্রার সঙ্গে হাঁটেন তখন কেন আমাদের অবাক হতে হবে?

সোরোস এবং কংগ্রেস উভয়েই আদানিকে লক্ষ্য করলে কেন আমাদের অবাক হতে হবে?

কেন আমরা অবাক হব যখন সোরোস-অধিভুক্ত প্রচার সাংবাদিকরা শাসন পরিবর্তনের জন্য কাজ শুরু করে?

পরিবর্তে, আমাদের আশ্চর্য হওয়া উচিত যে গান্ধী পরিবারকে জিজ্ঞাসা করার সাহস একটি মিডিয়ারও নেই। যে ড্রাগ লর্ড অনৈতিকভাবে মূর্তিমান প্রতীক, দেশ এবং ব্যাংক ভাঙা ভারতবিরোধী সোরোসের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক কী?

তথ্যসূত্র : Vijay Patel @ vijygajera aug 11, 2023

ভারতের মসৃণভাবে চাঁদে পা, প্রক্ষাপটে নানা কথা

২০২৩ সালের ২৩ আগস্ট সন্ধ্যা ৬টা ৪ মিনিট এই মাহেন্দ্রক্ষণের ৪ বছর আগে চন্দ্রের পৃষ্ঠ থেকে মাত্র ২ কিমি উপর থেকে আছড়ে পড়েছিল চন্দ্রযান-২। ব্যর্থতার কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন প্রাক্তন ইসরো চেয়ারম্যান শিবন। সেবার ইসরো প্রধানকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এবার ইসরোর এই সাফল্যে গোটা দেশ গর্বিত, এ এক অসাধারণ মুহূর্ত।

১৪০ কোটি ভারতবাসী গর্বিত। প্রধানমন্ত্রী বলেন, টিম চন্দ্রযানকে, বিজ্ঞানীদের আমার শুভেচ্ছা। আমেরিকা, চীন, রাশিয়ার পর ভারতই চতুর্থ দেশ যারা মহাকাশবিজ্ঞানে সবচেয়ে সফল। গোটা বিশ্বের সংবাদমাধ্যমে ভারতের জয়গান আসলে মোদীরই জয়গান। মোদী বিরোধী কুলের বক্তব্য, ধর্ম নিয়ে মোদি ও বিজেপি এগোতে চায়, তাকে হারিয়ে দিয়েছে বিজ্ঞান। বিজ্ঞান ছাড়া আধুনিক জীবন অকল্পনীয়। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে বিজ্ঞান ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কৃষিক্ষেত্রে, শিল্পক্ষেত্রে, চিকিৎসা ক্ষেত্রে, শিক্ষাক্ষেত্রে, বৈদ্যুতিক ও পারমাণবিক ক্ষেত্রে শুধু তাই নয়, প্রকৃতির রহস্য ভাণ্ডারের মূল্যবান মণি-মাণিক্য যে জ্ঞানভাণ্ডারকে করেছে ঐশ্বর্যময়।

আবার যুদ্ধোন্মত্ত পৃথিবীর দিকে চোখ ফেরালে সভ্যতাকে বিধ্বংসী মনে হয়। মনে প্রশ্ন জাগে এবং আমরা যদি অনুপুঙ্খ ভাবে ভাবি মনে হবে বিজ্ঞান যা বিশেষ জ্ঞান এটা কি আকাশ থেকে পড়ে? এটা মানুষ কীভাবে পেল? উত্তর খুজলে দেখা যাবে মানুষ এ জ্ঞান ভাণ্ডার প্রাপ্ত হয়েছে ঈশ্বরের দান হিসেবে, মানুষের মস্তিষ্কে।

যে ধর্ম সত্য বরং রাজনৈতিকভাবে ধর্মকে কাজে লাগিয়ে হিংসায় বিভেদ সৃষ্টি করে দেশকে ভাগ করেছে এবং আজও ধর্মকে কাজে লাগিয়ে কুৎসিতভাবে ভারতকে দুর্বল করার চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সর্বক্ষেত্রে 'সবকা সাথ সবকা বিকাশ' এমনকী ইসরোতেও সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার কোনো স্থান নেই, ভারতের লক্ষ্য 'বিশ্বের কল্যানে হোক' বিশ্বে প্রশংসিত।

—**রবীন্দ্রনাথ রায়,** সাহেবের হাট,
রাশিডাঙ্গা, কোচবিহার।

ঠেংড়ীজীর কথা সত্য প্রমাণিত হয়েছিল

প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাগান্ধী নির্বাচনী মোকদ্দমায় পরাজিত হলেন। পদত্যাগ না করে ২৫ জুন ১৯৭৫-এ সমগ্র দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করলেন। এই ঘোষণায় ব্যক্তিগত মৌলিক অধিকার এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আর থাকলো না। জয়প্রকাশ নারায়ণ, মোরারজী দেশাই, অটলবিহারী বাজপেয়ী, এল কে আদবানী এবং তৎকালীন সরসঙ্ঘচালক বালাসাহেব দেওরসকে গ্রেপ্তার করা হলো।

এই স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে নানাজী দেশমুখের নেতৃত্বে আন্দোলন করার জন্য লোকসঙ্ঘর্ষ সমিতি গঠন করা হলো। নানাজীর হাতে লেখা চিঠি নিয়ে অনন্তলাল সোনী কটকে এসে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। ওই চিঠিতে লেখা ছিল সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় এবং ভারতে রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত ইন্দিরা গান্ধীকে জরুরি অবস্থা জারি করার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন। ওড়িশার যোগাযোগ কেন্দ্র আগ্রা, এই কথা চিঠিতে উল্লেখ ছিল। যারা গ্রেপ্তার হয়েছেন তাদের নাম দেওয়াল লিখনে সাধারণ মানুষকে জানাবার নির্দেশ ছিল। আমাকে ওড়িশা লোকসঙ্ঘর্ষ সমিতির আহ্বায়ক করা হলো। কিছুদিন পর নানাজী গ্রেপ্তার হলেন এবং দত্তপন্থ ঠেংড়ী ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ থেকে সাময়িকভাবে ইস্তফা দিয়ে সমিতির অখিল ভারতীয় দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দত্তপন্থজীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫ আমি কলকাতায় গেলাম। ইতিমধ্যে পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ দত্তপন্থজীকে ধরবার জন্য ৫০ হাজার টাকা ঘোষণা করেছে। অতি গোপনে মধ্য কলকাতার এক বাড়িতে আমরা ১০/১২ জন মিলিত হলাম। অধিকাংশই ছিলেন বি এম এসের সদস্য। কিছুক্ষণের মধ্যে পৌঁছলেন ঠেংড়ীজী। দক্ষিণ ভারতীয় পোশাকে পরিচিত ঠেংড়ীজীকে চেনার কোনো উপায় ছিল না। ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনা হলো। মার্কস্‌বাদী সাংসদ জ্যোতির্ময় বসু এবং এ কে গোপালন গ্রেপ্তার হওয়া সত্ত্বেও ওরা আন্দোলনে অনিচ্ছুক। ইন্দিরা গান্ধীর আহূত জনসভায় হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতি। সুতরাং এখন আন্দোলনের সময় নয়, সকলে এ বিষয়ে একমত হলেন।

সকলের বক্তব্য শোনার পর ঠেংড়ীজী গম্ভীরভাবে বললেন— আগামী ১৭ মাসের মধ্যে ইন্দিরা গান্ধীর পতন হবে। এটা কী কোনো জ্যোতিষীর কথা? আমি প্রশ্ন করলাম। উত্তরে বললেন না। স্বৈরাচারী শাসন চালালেও স্বৈরাচারী শাসকের যোগ্যতা ইন্দিরা গান্ধীর মধ্যে নেই। তাঁর কাছে কোনো শক্তিশালী গোষ্ঠী নেই। তিনিও কাউকে বিশ্বাস করেন না। এই অবস্থায় বেশিদিন প্রশাসন চলতে পারে না। গাড়ির ইঞ্জিন খারাপ হলে যেমন কিছুদূর এগিয়ে থেমে যায় তেমনি এই প্রশাসনও থেমে যাবে।

ঠেংড়ীজীর এই কথা শোনার পর পরিবেশ হালকা হয়ে গেল। একজন বললেন, জর্জ ফার্নান্ডেজ অনেক ডিনামাইট সংগ্রহ করেছেন, কিন্তু ফেলার লোক নেই। হাওড়ার বেলুড়ের রবীনদা শোনালেন আর এক আশ্চর্য ঘটনার কথা। রবীনদা ছিলেন স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার কর্মচারী ইউনিয়নের সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক এবং পূজনীয় ভরত মহারাজের সম্পর্কিত। রবীনদা বললেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এ.এন.রায় বেলুড় মঠে ভরত মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন। জরুরি অবস্থা ঘোষণার পরের দিন ভরত মহারাজ রবীনদাকে ডেকে বলেছিলেন আরএসএসকে নিষিদ্ধ করে ইন্দু (ইন্দিরা গান্ধী) ঠিক কাজ করেনি। জ্যোতি বসুও গোপনে ভরত মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেছিলেন রাত্রিবেলা। সবশেষে রবীনদা শ্রীগুরুজী প্রসঙ্গ আনলেন। শ্রী গুরুজী প্রয়াণের আগে শেষবার ১৯৭৩-এর

ফঃ ৩

প্রথমদিকে আসেন বেলুড় মঠে। সাক্ষাৎ করেন পূজনীয় ভরত মহারাজের সঙ্গে। মহারাজের ঘরে ঢোকার পরেই শ্রী গুরুজী বলেন, এবার আমি চললাম। প্রণাম করলেন মহারাজের পাঁ ছুঁয়ে। চোখে জল এল মহারাজের। তিনি বলেন স্বামী অখণ্ডানন্দের সময় থেকে তুমি নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে চলেছ।

রাত্রি দুটোর সময় প্রস্থান করলেন ঠেংড়ীজী। আমাকে বললেন বি এম এস অফিসে থেকেই কাজ কর। ভূমিগত হওয়ার প্রয়োজন নাই। আমি ফিরে এলাম কটকে। ওড়িশার সর্বোদয় নেত্রী রমা দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে গান্ধী জয়ন্তী পালন ও শোভাযাত্রার পরিকল্পনা করলাম। পোস্টার ও প্রচারপত্র কলকাতা থেকে ছাপিয়ে আনা ও বিতরণের ব্যবস্থা হলো। কিন্তু ১৯৭৫-এর ২০ সেপ্টেম্বর মিসা (Maintinence of Internal Security Act) আইনে আমাকে গ্রেপ্তার করা হলো। আমি মুক্তি পেলাম ১৯৭৭-এর মার্চ মাসে কেওনঝর জেল থেকে। হিসেব করে দেখা গেল ঠিক ১৭ মাস টিকে ছিল ইন্দিরা সরকার।

—সরোজ কুমার মিত্র,
কটক, ওড়িশা।

খ্রিস্টান মিশনারি ও বনবাসী কল্যাণ আশ্রম

ইংরেজ ভারত থেকে চলে যাওয়ার আগে খ্রিস্টান মিশনারিদের হাতে প্রভূত সম্পত্তি তুলে দিয়ে যায়। ব্রিটিশ রাজ থাকাকালীন ওদের প্রভাব প্রতিপত্তি তো ছিলই। ব্রিটিশ চলে যাওয়ার পরেও ওদের প্রতিপত্তি একচুলও কমেনি। এই মিশনারিরা কাজ করতো রিক্ত বঞ্চিত তফশিলি সমাজ ও পাহাড় জঙ্গলের গিরিবাসী ও বনবাসী সমাজ নিয়ে। এটা খুব দুঃখজনক হলেও সত্য যে এই সব সমাজের মানুষের কাছে সরকারের সামান্য সুযোগ সুবিধা পৌঁছাতো না। শিক্ষা, স্বাস্থ্য তো দূর যোগাযোগ ব্যবস্থাও ছিল দুর্গম। এই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে খ্রিস্টান মিশনারিরা। তারা শিক্ষা ও চিকিৎসা দিয়ে ওই দরিদ্র মানুষদের সাহায্য করে শুধু ধর্ম পরিবর্তন করেনি, করেছিল ভারত বিরোধীও। ওদের মৌখিক ভাবে বুঝিয়ে কোনো কাজ হয়নি। তখন এই ব্যাপারে কী করা যায়, কীভাবে এই মানুষজনের পাশে দাঁড়ানো যায় সেই সব ঘটনার বিচার বিশ্লেষণ করে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকর্তারা সঙ্ঘের প্রচারক বালাসাহেব দেশপাণ্ডেকে দায়িত্ব দেন। তার অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে ১৯৫২ সালে জন্ম নেয় অখিল ভারতীয় বনবাসী কল্যাণ আশ্রম।

সেই ১৯৫২ সালে যাত্রা শুরু। একটা ছোট্ট প্রদীপ কালক্রমে উজ্জ্বল তারকায় পরিণত হয়। কাজ শুরু হয় শিক্ষা ও চিকিৎসা দিয়ে। পরবর্তীকালে প্রত্যন্ত দুর্গম স্থানে শুরু হয় স্কুল, ছাত্রাবাস, চিকিৎসা কেন্দ্র। যাতে আর কাউকে ভুল বুঝিয়ে ধর্মান্তরিত করতে কেউ না পারে। দেশ স্বাধীন হওয়ার ৫ বছর পরেই শক্তিশালী খ্রিস্টান মিশনারিদের সামনে পাহাড় হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে এই অখিল ভারতীয় বনবাসী কল্যান আশ্রম। পশ্চিমবঙ্গে কাজ শুরু হয় ১৯৭৬ সালে। পূর্ব ভারতের দায়িত্ব দেওয়া হয় বসন্ত রাও ভট্টকে। এখানে পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রম নামে। বসন্ত রাওয়ের চেষ্টায় অনাথ শিশুদের দায়িত্ব নিয়ে মানুষ গড়ার কাজ শুরু হয়। এক প্রকার দান নিয়েই এই সংগঠন চলে। জনগণের কাছ থেকে ছাত্রদের বাৎসরিক, মাসিক ও সাপ্তাহিক খরচ নেওয়া হয়। পৌষ সংক্রান্তিতে হিন্দু সমাজ দান করেন। প্রচুর মানুষ এই দিনে কল্যাণ আশ্রমকে আর্থিক ও বস্ত্র, পুস্তক, খাদ্য সামগ্রী ও ওষুধ দান করেন। আশ্রমের ছাত্র ছাত্রীদের ভারতীয় ভাবনা বৃদ্ধির জন্য, 'ভারতবর্ষ আমার বাড়ি' কার্যক্রমে প্রত্যন্ত পাহাড়ি এলাকায় ছাত্র-ছাত্রীদের দেশের বিভিন্ন স্থানের মানুষের বাড়িতে রেখে একাত্মতা বাড়ানোর কাজ করা হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে অলিম্পিকের মতো সর্বভারতীয় খেলার ব্যবস্থা করা হয়। এখান থেকে দেশকে পদক এনে দিয়েছে প্রচুর খেলোয়াড়। দেশের প্রতিরক্ষায় যোগদান করেছেন বহু ছাত্র। তারা উজ্জ্বল করেছে কল্যাণ আশ্রমের নাম।

বিশেষ করে পূর্বোত্তর রাজ্যগুলি বারবার এই জন্য সংবাদের শিরোনামে এসেছে। অতি সম্প্রতি মণিপুর তার জ্বলন্ত উদাহরণ। ওখানে দেশের ধর্মান্তকরণ বিরোধী আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে বিগত দীর্ঘ ৭০ বছর ধরে ধর্মান্তরণ করা হয়েছে ওখানে। জনজাতি মৈতেই সমাজ থেকে লোভ ও ভয় দেখিয়ে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করানো হয়। এতেই ধর্মীয় ভারসাম্য নষ্ট হওয়াটাই অশান্তির কারণ। সত্যি কথা বলতে গেলে বলতে হয় বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের কারণেই পূর্বোত্তর রাজ্যগুলিতে শান্তি বজায় আছে। ওখানে অশান্তি সৃষ্টি করা হয় রাজনৈতিক কারণে আর রাজনৈতিক কারবারিদের মাধ্যমে। যারা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বিরোধী তারা সামনাসামনি স্বীকার না করলেও মনেপ্রাণে স্বীকার করে। বহু মানুষের ত্যাগে সৃষ্টি অখিল ভারতীয় কল্যাণ আশ্রম আজ জনজাতি মানুষদের ভরসার স্থল।

—শ্যামল কুমার হাতি,
চাঁদমারি রোড, হাওড়া-৯।

শব্দ ও ভাষার সৃষ্টি

শিশু জন্মের কয়েক মাস পরে কিছু উচ্চারণ করতে শেখে, অন্যতম উচ্চারণ হচ্ছে 'ম'। এই 'ম'-এর সম্ভাব্য বিবর্তন নিম্নভাবে লেখা যায়। ম-ম-ম = মাতা/মাতৃ/অম্বা আবার মাতা/মাতৃ/অম্বা = অম্মা= মা = মাই = আই। এখানে ম বা মা হচ্ছে মূল শব্দ। মা শব্দকে সম্পাদনা বা সংস্কার করে মাতা, মাতৃ, অম্বা করা হয়। এরূপ সম্পাদিত শব্দকে আর্য বা সংস্কৃত শব্দ বলা যায়। আবার মাতা বা মাতৃ বা অম্বা শব্দ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে অম্মা, মা, আই, শব্দে রূপান্তরিত হয়। বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, বিভিন্ন মৌখিক উচ্চারণকে অবলম্বন করে শব্দ তৈরি হয়। এছাড়া বডি ল্যাঙ্গুয়েজ করার সময় উত্তেজনায় বিভিন্ন ধরনের উচ্চারণ বা ধ্বনি বেরোত। এসব ধ্বনি আওয়াজের অনুকরণে শব্দ সৃষ্টি হতো। এছাড়াও অন্য উৎসে শব্দ সৃষ্টি হতো। পাখির ডাক, নদী প্রবাহ, বায়ু প্রবাহের শব্দ থেকে শব্দ সৃষ্টি হতো। বিভিন্ন ধরনের আওয়াজকে অনুকরণ করে শব্দ বা শব্দভাণ্ডার তৈরি হয়। শব্দভাণ্ডারে সব সময় শব্দের যোগ বিয়োগ চলতে থাকে এবং এখনও চলছে। বলা বাহুল্য, যথেষ্ট শব্দ গঠনের পর ভাষা তৈরি হতে থাকে।

—রাজকুমার জাজোদিয়া,
কালিয়াগঞ্জ।

ভ্রূণহত্যা মহাপাপ

লক্ষ্মী দাস

আজকের দিনে ছেলে-মেয়ের কোনো তফাত নেই— একথা মুখে বললেও কার্যক্ষেত্রে অনেকেই মানেন না। বংশ রক্ষা করার জন্য ছেলে না হলেই নয়। আর মেয়ে মানেই তাকে খাইয়ে, পড়িয়ে পরের বাড়িতে পাঠাতে হবে। তাই ছেলে হলে আনন্দে মিষ্টি বিতরণ করা হয় আর কন্যা হলে একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস, কত চিন্তা, কীভাবে তাকে বিয়ে দেবে, কত খরচ ইত্যাদি। এই আধুনিক যুগেও শিক্ষিত সমাজে খুব কম পরিবার আছে, যাঁরা প্রথম সন্তান মেয়ে হলে হাসিমুখে পরিবারের সদস্য বলে মেনে নেন। কোনো কোনো বাড়িতে মেয়ে হয়েছে বলে সদ্যোজাত শিশু এবং তার মায়ের উপর চলে নির্যাতন। আবার কোথাও দেখা গেছে, ছেলের প্রতীক্ষায় থেকে থেকে পাঁচ-পাঁচটি কন্যা সন্তান হয়ে গেছে। কিন্তু ভেবে দেখছেন না এভাবে পরিবার কত বড়ো হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে সংসারে নানা রকম অভাব অনটন দেখা দিচ্ছে। পড়াশোনা, ভবিষ্যৎ তাদের নিয়ে ভাববার অবকাশ কোথায়? অবহেলায় অনাদরে তাদের বড়ো হতে হয়। রাস্তার ধারে ডাস্টবিনেও সদ্যোজাত শিশু পাওয়ার অনেক নজির আছে। জানি না মানুষ কীভাবে এত নিষ্ঠুর হতে পারে! নাই-বা হলো ছেলে, মেয়েকেই ছেলের মতো করে মানুষ করলে একদিন সেই বংশের মুখ উজ্জ্বল করবে। একটা ছেলে মানুষ করতে যেমন খরচ হয়, তেমনি মেয়ের ক্ষেত্রেও। আবার ছেলেকে বিয়ে দিতে যেমন খরচ হয়, তেমনি মেয়ের ক্ষেত্রেও। আবার একটা ছেলের বিয়ে দিতে গেলেও একটা মেয়েকেই দরকার হয়। তবে কেন এই বৈষম্য?

বর্তমানে উন্নত প্রযুক্তির ফলে আমরা খুব সহজেই জানতে পারি গর্ভস্থ শিশুটির অবস্থান, আকৃতি, গঠন, এমনকী পুত্রসন্তান না কন্যাসন্তান। তাই বলে কি কন্যা সন্তানটিকে কুঁড়িতেই নির্মমভাবে হত্যা করতে হবে? কেন সে এই পৃথিবীর আলো দেখতে পাবে না, কেন সে এই সমাজের এক জন সদস্য হওয়া থেকে বঞ্চিত হবে? সে তো কারো কোনো ক্ষতি করেনি, তবে কেন তার ওপর এরকম নিষ্ঠুর অত্যাচার। এধরনের কাজ করার আগে একটুও কি মনে হয় না যে, এটা কত পাপ! এমন কত



পরিবার আছে যাদের একটা শিশুর জন্য হাহাকার করতে হয়। আবার এমন কত পরিবার আছে তাদের অনায়াসে হত্যা করছে। এভাবে হত্যা করতে গিয়ে কত সময় তো মাকেও জীবনের অনেক ঝুঁকি নিতে হয়। মায়ের জীবন-মরণ সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।

সমাজে ছেলে ও মেয়ে উভয়েরই প্রয়োজন আছে। এভাবে কন্যা সন্তানের কমে যাওয়ার ফলে ছেলে ও মেয়ের অনুপাত কমে যাচ্ছে। এটা ভুললে চলবে না যে ছেলে ও মেয়ে একে অন্যের পরিপূরক। এতে সমাজের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাবে। আমাদের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর কথা কে না জানে! এখন আমাদের কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ, তিনিও তো মেয়ে হয়ে দেশের সেবা করছেন। এঁরাও আমার আপনার বাড়ির মতো সাধারণ ঘরেরই মেয়ে। সুতরাং আজকের দিনে মেয়েরা কোনো অংশেই ছেলের থেকে কম নয়। তারাও আজ শুধু ঘরে বসে না থেকে বাইরের জগতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অলিম্পিকে, এশিয়াড গেমসে দেশকে পদক এনে দিচ্ছে, দেশকে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে দিচ্ছে। এটা আমাদের কাছে কি গর্বের বিষয় নয়? মহাকাশে পাড়ি দিচ্ছে, অফিস-কাছারিও করছে, ব্যবসাও করছে, ঘরে এসে সংসারও সামলাচ্ছে, আবার বাচ্ছাকেও মানুষ করছে। দশভুজার মতো দশদিক সামাল দিচ্ছে। এর জন্য অবশ্যই পরিবারের সহযোগিতা একান্ত দরকার।

মেয়েরা ছাড়া সমাজ হতে পারে না। তাই মেয়েদের বাঁচাতে আমাদের সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই প্রসঙ্গে তাঁর ভাষণে বলছেন যে, 'একটা মেয়ে জন্মালে তার নামে পাঁচটা গাছ লাগাও। দেখা যাবে মেয়ে বড় হতে হতে গাছগুলো পরিণত হয়ে যাবে'। আর তখন তাদের উচ্চশিক্ষা কিংবা বিয়ের জন্য কাউকে কোনো চিন্তা করতে হবে না। এছাড়া সমাজের সকলের কথা তিনি ভেবে জন-ধন যোজনা চালু করেছেন।

জীবনে চলার পথে বাধা-বিপত্তি, সমস্যা তো থাকবেই, তাকে সুষ্ঠুভাবে সমাধানও করতে হবে। আইন করে এসব আংশিক বন্ধ করা গেলেও সবাইকে বোঝানো সম্ভব হবে না। তাই মেয়েদের সচেতন হতে হবে। এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। মেয়ে হয়ে মেয়েদের হত্যা নয়, রক্ষা করব— এই সঙ্কল্প গ্রহণ করলেই ভ্রূণ-হত্যার মতো পাপাচার সমাজ থেকে দূর করা যাবে। তবেই সুন্দর কুঁড়িগুলো আর অকালে দলিত মথিত না হয়ে সুন্দর সুন্দর ফুলে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠবে আমাদের সমাজ। ■



টিনেজার স্ট্রেস

ডাঃ পার্থসারথি মল্লিক

বছর তোরোর সানি। পর্দার আড়াল থেকেই শুনছিল মা-বাবার কথাবার্তা। আগেও এরকম পরিস্থিতির সামনে পড়তে হয়েছিল তাকে। কিন্তু কোনোক্রমে কান্নাকাটি করে বেঁচে গেছিল সে যাত্রায়। কিন্তু এবার কী করবে সে। এবার বোধহয় বোর্ডিং স্কুলে যাওয়া একেবারে পাকা। শত কান্নাকাটি করলেও বুঝবে না বাবা-মা। অন্ধকার ঘরে শুয়ে শুরু হলো মুখ বুজে কান্না।

ক্লাস ওয়ান থেকেই জেভিয়ার্সে পড়াশোনা করছে সানি। ওয়ানের এন্ট্রান্স টেস্টে সিক্সথ হয়েছিল সে। সেই সঙ্গে সুইমিং, ক্রিকেট, ড্রয়িঙেও বেশ কিছু প্রাইজ এনেছে। কিন্তু বছর খানেক হলো সানি একটু অন্যমনস্ক। পড়াশোনায় মন নেই। সকাল থেকেই শুরু হয় ছোটা। সকালে সুইমিং, তারপর স্কুল, তারপর ক্রিকেট ট্রেনিং, ড্রয়িং ক্লাস, টিউশন করতে করতে নাজেহাল অবস্থা তার। তার ওপর আবার পাশের বাড়ির তিতলি ভালো রেজাল্ট করায় বাবা-মায়ের অভিমান। তারা চায় সানি যাতে অলরাউন্ডার হয়। কিন্তু চাপের মধ্যে পড়ে কোনোটাই সে সামলাতে পারছে না ঠিকমতো। এমনকী কিছুদিন আগেই ক্লাস ইলেভেনের এক সিনিয়র দাদার কাছ থেকে সিগারেটে দুটান মেরেছিল সে। তারপর থেকে মাঝে মাঝেই সিগারেটের ধোঁয়া ওড়ায় সানি। অনেকটা হালকা লাগে নিজেকে। কিন্তু দিনের পর দিন একটা গভীর হতাশার মধ্যে ডুবে যাচ্ছে সে। বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে মিশতে, খেলতে ভালো লাগছে না তার। হঠাৎ কেমন ভালো না লাগায় পেল সানিকে, সেটাই বুঝে উঠতে পারছে না সে। শুধু সে কাঁদে, তার মানুষজনেরাও বুঝতে পারছে না তাকে। দিনের পর দিন কেমন বদলে যাচ্ছে সবকিছু। এবার তার ঠিকানা বোর্ডিং স্কুল। মা-বাবাকে ছেড়ে নতুন পরিবেশ।

সানির মতো অনেকেই রয়েছে আমাদের চারপাশে। বয়ঃসন্ধিকাল বা অ্যাডোলেসেন্ট পিরিয়ডে কোনো না কোনো কারণে বাচ্চারা হতাশার শিকার হতে পারে। কখনো পড়াশোনার চাপ, কখনো এক্সট্রা ক্যারিকুলার অ্যাক্টিভিটির চাপ, আবার কখনো ইঁদুর দৌড়ের প্রতিযোগিতার চাপ। সবকিছু একসঙ্গে সামলাতে হিমসিম খায় তারা। এখান থেকেই তৈরি হয়ে যায় মানসিক অবসাদ বা ডিপ্রেশন।

২০২১ সালে একটি হাইস্কুলের ৮১৫ জন ছাত্র-ছাত্রীর ওপর সমীক্ষা করে দেখা গেছে, ৭০ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী প্রচণ্ড স্ট্রেসে রয়েছে। বলাই বাহুল্য ২০২২-এ দাঁড়িয়ে পরিসংখ্যানটা বেড়ে গেছে। অবসাদ, স্ট্রেস যে কোনো বয়সেই আসতে পারে। কিন্তু টিনএজ স্ট্রেস অবহেলা করলে মারাত্মক আকার নিতে পারে। কারণ এই বয়সে এক্সপ্রেস করার ক্ষমতা কম থাকে। এছাড়া এই সময়ের স্ট্রেসের লক্ষণও বাবা-মা বুঝে উঠতে পারেন না। সাধারণ দুষ্টুমি বলে মনে করে উলটোভাবে ট্রিট করেন। শুধু পড়াশোনার চাপই নয়। মা-বাবার ডিভোর্স, স্কুল পরিবর্তন, বন্ধুর সঙ্গে সমস্যা, প্রিয়জনের মৃত্যু, একাকিত্ব এসব থেকেই হতে পারে স্ট্রেস। টিনএজ স্ট্রেস অবহেলা করা উচিত নয়। আপনার ছেলে অথবা মেয়ে যদি হঠাৎ করেই অমনোযোগী হয়ে যায়, অল্প পরিশ্রমেই ক্লান্ত হয়ে পরে, পেটব্যথা, মাথাব্যথা যদি রোজকার সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়, সবসময় একা থাকতে চায়, সব কাজেই অনীহা দেখেন তাহলে সেটাকে অবহেলা না করে খোলাখুলি কথা বলুন তার সঙ্গে। কারণ এই সাধারণ সমস্যাও পরে বড়ো আকার নিতে পারে। যেমন ইটিং ডিসঅর্ডার, ডিপ্রেশন, নিজেকে আঘাত করার প্রবণতা, অ্যালকোহল বা ড্রাগ নেওয়া, এমনকী আত্মহত্যাপ্রবণও হয়ে যেতে পারে। তাই সমস্যাগুলো ছোটখাটো বলে ফেলে রাখা উচিত নয়। প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞের পরামর্শও নিতে পারেন।

ছেলে-মেয়ে যাদের গড় বয়স উনিশের মধ্যে, কেন হয় এই ধরনের সমস্যা? এই ধরনের সমস্যা থেকে নিজের সন্তানকে বের করে আনার জন্য পরিবারের কতটা দায়িত্ব আছে?

টিনেজার একটা স্পেশাল এজ গ্রুপ। এই সময় একটা বিরাট পরিবর্তন আসে, অন্য কোনও বয়সের ক্ষেত্রে এতটা পরিবর্তন হয় না। এই চেঞ্জটাকে হ্যান্ডেল করাই একটা বড়ো ব্যাপার। আর সঙ্গে আছে আরও নানা সমস্যা। এর অনেকগুলো কারণ হলো—

প্রথম কারণই হচ্ছে ভূমিকা বদল। একটা বাচ্চা সবসময় বাবা-মায়ের দ্বারা প্রোটেক্টেড। বাচ্চা দোষ করলেও সেটাকে দোষ বলে ধরা হয় না। বরং তারা ছোটো বলে ছাড় পেয়ে যায়। কিন্তু টিনএজার গ্রুপে আসার পর সেটা আর হয় না। তার কারণটা হলো তারা একটু বড়ো হয়েছে কিন্তু পুরো বড়ো হয়নি। আবার বাচ্চাদের মতো সুযোগ সুবিধাও তারা পায় না। আবার ভুল করলেও তারা ক্ষমাও পায় না।

বড়োদের মতো স্বাধীনতা এবং ক্ষমতাও তাদের থাকে না। এটা একটা কনফিউজিং অবস্থা। এই সময়টা চেহারার গঠনগত কিছু পরিবর্তন ঘটে। গলার স্বরও পরিবর্তন হয়। মেল সেক্স হরমোন এবং ফিমেল সেক্স হরমোন নিঃসৃত হতে শুরু করে। তাঁদের মধ্যে লোক দেখানোর ব্যাপারটা চলে আসে। এতে নিজের মধ্যে দ্বন্দ্বটা বাড়ে।

নিজের কেরিয়ার নিয়ে চিন্তা করার সময়। বড়ো হয়ে কী করব? এমনকী পরীক্ষার ফল নিয়ে চিন্তা। মাধ্যমিকের পর থেকে শুরু হয় গুরুত্বপূর্ণ সময়। যারা এর পরও ভালো করে তারা সবার কাছে গুরুত্ব পায়। আর যারা কিছু করতে পারে না তাদের গুরুত্বটাও কমে থাকে। □



চন্দ্রপৃষ্ঠে বিক্রমের সফল অবতরণ ভারতীয় বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্বই প্রমাণ করে

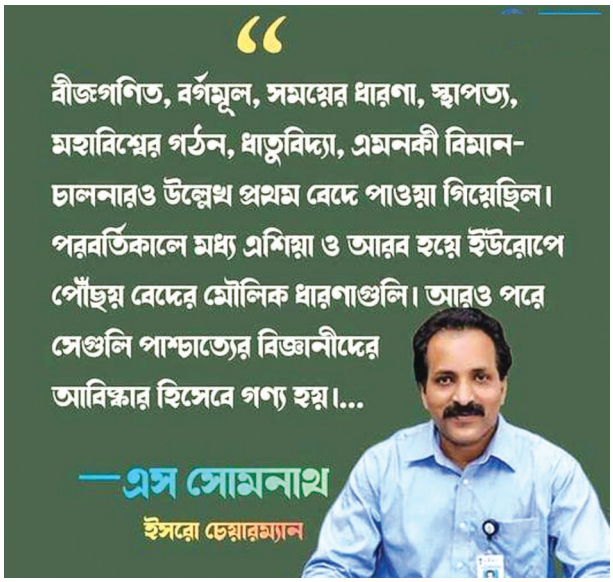
ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা আগামীদিনে আরও আরও এগিয়ে যাবে। এরপরের লক্ষ্য শুক্র, তারপর সূর্য, তারপর হয়তো আরও দূরের কোনো ছায়াপথ।

মন্দার গোস্বামী

অবশেষে আমরা সফল হলাম। ২৩ আগস্ট, বুধবার সন্ধ্যায়, কাঁটায় কাঁটায় ছটা বেজে চার মিনিটে ল্যান্ডার বিক্রমের চাঁদের মাটি আলতো ছোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গে রচিত হলো আত্মনির্ভর ভারতের এক নতুন ইতিহাস। উৎসাহ উদ্দীপনায় মেতে উঠল আপামর দেশবাসী। ঢাকঢোল, যাগযজ্ঞ, ধর্মীয় স্তোত্রপাঠ, শঙ্খধ্বনির মাধ্যমে আমরা বরণ করে নিলাম ঐতিহাসিক মাহেন্দ্রক্ষণটিকে। ভারতের বাইরে বিদেশেও ভারতীয় অথবা ভারতীয় বংশোদ্ভূতরা আনন্দে মেতে উঠল। ফেটে পড়ল বাঁধনহারা উচ্ছ্বাসে। সমগ্র বিশ্ব প্রত্যক্ষ করল এক স্বতঃস্ফূর্ত ভারতীয় নবজাগরণ। অসংখ্য ধন্যবাদ ইসরোর বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদদের। ধন্যবাদ এই অভিযানের সঙ্গে পরোক্ষভাবেও যুক্ত বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ-সহ অন্যান্য কলাকুশলীদের। স্বাধীনতার অমৃতকালে এ এক অভূতপূর্ব অনন্য 'অমৃত' প্রাপ্তি।

পূর্বতন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী বলেছিলেন, 'জয় জওয়ান, জয় কিষাণ, জয় বিজ্ঞান'। আজ ভারতীয় বিজ্ঞানের জয়পতাকা অটলবিহারীর সুযোগ্য উত্তরসূরির যোগ্য নেতৃত্বে চাঁদের মাটিতে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত। এর আগেও চন্দ্রাভিযান হয়েছে। সেক্ষেত্রে আমরা আংশিক সফলতা পেয়েছি। ব্যর্থ হলেও প্রচেষ্টা কিন্তু থেমে থাকেনি।

সমালোচকরা সমালোচনা করে গেছেন। গরিব ভারতবর্ষের কোটি কোটি টাকা খরচা করে চন্দ্র অভিযানের প্রয়োজন কী! এইরকম সস্তা প্রশ্ন বিভিন্ন চ্যানেলে, সংবাদমাধ্যমে প্রতিনিয়ত তোলা হয়েছে। চন্দ্রযান-২ এর আংশিক ব্যর্থতার পর এই প্রশ্ন আরও বেশি করে প্রচারিত হয়েছে। ঈর্ষান্বিত বিদেশি শক্তির উৎসাহে, ভারতের অগ্রগতি রুখতে ভারতের অভ্যন্তরেই কিছু দেশবিরোধী শক্তি, বিশেষ করে নানা 'টুকরে টুকরে গ্যাং' চন্দ্রাভিযান-সহ ভারতীয় মহাকাশ অভিযানের নিরন্তর বিরোধিতা করে গেছে, এখনও করছে। আমরা সাফল্য উদ্‌যাপন করছি বটে, কিন্তু যদি ব্যর্থ হতাম, তখন! সমালোচকরা তৈরিই ছিলেন, পরপর দুটি ব্যর্থ অভিযানে বিপুল অর্থ অপচয়-সহ, ব্যর্থতার নানা দিকগুলিকে তথাকথিত বিচারবিশ্লেষণ করে দাঁত নখ বার করে ভারত সরকারকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করাতেন। লক্ষ্য অবশ্য একজনই, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।



তবে না তেমন কিছু হয়নি। আগের ব্যর্থতার পরেও, অতীতের ভুলগুলি থেকে শিক্ষা নিয়ে ইসরো-সহ অন্যান্য বিভিন্ন সংস্থার, অতীব মেধাসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিবিদরা নাওয়া খাওয়া ভুলে গবেষণা জারি রেখেছেন, সফলতার নতুন নতুন দিক উন্মোচিত করেছেন। লক্ষ্য পথে প্রতিনিয়ত পাশে থেকেছে ভারত সরকার এবং অতি অবশ্যই বিজ্ঞান গবেষণায় সদা সর্বদা উৎসাহ প্রদানকারী প্রধানমন্ত্রীর কথাবর্তা। চন্দ্রযান-২ -এর ল্যান্ডার বিক্রমের চন্দ্রপৃষ্ঠে ভেঙে পড়ার পর তৎকালীন ইসরো চেয়ারম্যান কে শিবন যখন মানসিকভাবে বিধ্বস্ত হয়ে অঝোরে কাঁদছিলেন, ভেঙে না পড়ে অবিলম্বে পরবর্তী চন্দ্রাভিযানের প্রস্তুতি নিতে বলেছিলেন প্রধানমন্ত্রী দেশ এখনও ভোলেনি সেই ঐতিহাসিক দৃশ্য। উৎক্ষেপণের পর ৩ লক্ষ ৮৫ হাজার কিলোমিটার দূরের চাঁদের মাটিতে বিবিধ জটিল গাণিতিক পথ বেয়ে 'পালকাবতরণ' সহজ কাজ নয়। বিশেষ করে চাঁদের দক্ষিণ মেরুর ওই অঞ্চলটি এমনই দুরূহ দুর্গম যে এর আগে কোনও দেশ সেখানে পৌঁছাতেই পারেনি। কিছুদিন আগেও ইজরায়েল, জাপানের এবং সম্প্রতি রাশিয়ার মহাকাশযান ওই অংশে অবতরণের সময় ভেঙে পড়েছে। চাঁদের এই এলাকায় তাই 'বিক্রমের' সফল অবতরণ ভারতীয় বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্বই প্রমাণ করে। চন্দ্রপৃষ্ঠে ভোর হয়েছে। ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিক্রমের গর্ভ থেকে বেরিয়ে এসেছে 'রোভার' প্রজ্ঞান। শুরু হয়েছে চন্দ্রপৃষ্ঠে তার পদচারণা। এ শুধু প্রজ্ঞানের নয়, যেন ১৪০ কোটি ভারতবাসীর চন্দ্রপৃষ্ঠে দৃপ্ত পদাচারণা। এবার তার আসল কাজ। সেই বৈদিক যুগ থেকে একসময়, ভারতীয়রা জ্ঞান-বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠ ছিল। বিশেষ করে জ্যোতির্বিদ্যায় আমরা ছিলাম যথেষ্ট পারদর্শী। আমেরিকা, ইউরোপ যখন অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত, তখন গ্যালিলিও, কেপলার, নিউটনদের অনেক অনেক আগে থেকেই আমাদের দেশে আর্যভট্ট, বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্তদের মতো মনীষীরা মহাকাশ গবেষণা করেছেন। সৌরজগৎ, গ্রহ নক্ষত্র, তাদের সঞ্চার পথ সম্পর্কে তাঁদের সম্যক ধারণা ছিল। আমাদের বিজ্ঞান চেতনা সমৃদ্ধ ঋষি মুনিরা প্রতিদিন ঊষাকালে সূর্য বন্দনার মাধ্যমে সূর্য থেকে আয়ু, প্রজ্ঞা, বল, বীর্য, শক্তি প্রার্থনা করতেন। প্রজ্ঞান সেই সূর্য থেকেই শক্তি সংগ্রহ করে ঘুরে বেড়াবে চন্দ্রপৃষ্ঠে। সংগ্রহ করবে বৈজ্ঞানিক বিবিধ তথ্য। চন্দ্রপৃষ্ঠে এঁকে দেবে অশোক স্তম্ভ এবং ভারতের জাতীয় পতাকার চিহ্ন। সমৃদ্ধ করবে ভারতীয় বিজ্ঞানকে, সমৃদ্ধ করবে বিশ্বের মহাকাশ গবেষণাকে। উন্মোচিত হবে অসীম সম্ভাবনার নব নব দিগন্ত। উপকৃত হবে সমগ্র বিশ্ববাসী।

চন্দ্রপৃষ্ঠে বিক্রমের অবতরণ এমন এক সময় ঘটল যখন দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে ব্রিকস সম্মেলন চলছে। ব্রিকসের সদস্য দেশগুলির মধ্যে রাশিয়া ও চীন আগেই চাঁদের মাটি সফল ভাবে স্পর্শ করেছে। চতুর্থ দেশ রূপে এখন ভারত সেই কৃতিত্বের অধিকারী। সমগ্র বিশ্ব থেকে শুভেচ্ছা আসছে। বিশ্বের সমস্ত মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রগুলি কুর্নিশ জানাচ্ছে ভারতের এই সাফল্যকে। মুখ তেতো করে হলেও চীনও বাধ্য হচ্ছে ভারতকে অভিনন্দন জানাতে। কয়েক বছর আগেও মহাকাশ গবেষণার এলিট ক্লাবে ভারতের অন্তর্ভুক্তি নিয়ে বিদেশের কাগজে ব্যঙ্গাত্মক চিত্র প্রকাশিত হতো। আজ তারাই ভারতের জয়গান গাইছে। তাই এই মুহূর্ত আনন্দের, মহা গৌরবের। চন্দ্রপৃষ্ঠে সফল অবতরণের পর সারা বিশ্বে ইসরো বন্দিত। যেসব ভারতীয় পড়ুয়া NASA, ESA (ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সি)-সহ অন্যান্য বিদেশি মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রগুলিতে গবেষণার স্বপ্ন দেখছিলেন, তাঁরা নিশ্চয়ই এবার গর্বের সঙ্গে ইসরোর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার কথা ভাববেন। বিদেশে মেধা পাচার কমবে। ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা আগামীদিনে আরও আরও এগিয়ে যাবে। এরপরের লক্ষ্য শুক্র, তারপর সূর্য, তারপর হয়তো আরও দূরের কোনো ছায়াপথ। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কতকাল আগেই বলে গিয়েছিলেন...

'মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকাল-মাঝে
আমি মানব একাকী ভ্রমি বিস্ময়ে, ভ্রমি বিস্ময়ে'।। ■

চন্দ্রযানের সাফল্যে পশ্চিমবঙ্গের কুশীলবেরা



বিজয় দাই

- বাড়ি: বীরভূমের মল্লারপুরের দক্ষিণগ্রামে
- পড়াশোনা: কল্যাণী সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে বি-টেক। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম-টেক।
- ইসরো: চন্দ্রযান-৩-এ 'অপারেশন টিম' -এর সদস্য।



সৌম্যজিৎ চট্টোপাধ্যায়

- বাড়ি: বীরভূমের সিউড়ির রায়পুরে
- পড়াশোনা: বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং-এ বি-টেক।
- ইসরো: রিমোট সেন্সিং স্পেসক্র্যাফ্ট মিশনে যুক্ত। চন্দ্রযান -৩-এর অপারেশন ডিরেক্টর (মিশন সফটঅয়্যার)।



কৃশানু নন্দী

- বাড়ি: বাঁকুড়ার পাত্রসায়রের ডান্না-তে
- পড়াশোনা: আরসিসি ইনস্টিটিউট অব ইনফর্মেশন টেকনোলজি থেকে বি-টেক, এম-টেক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে।
- ইসরো: চাঁদে নামার পরে রোভার বা রোবট গাড়ির গতিবিধি সমন্বয়ের দায়িত্বে থাকা দলের সদস্য



তুষারকান্তি দাস

- বাড়ি: মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায়
- পড়াশোনা: বহরমপুরের কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে গণিতে স্নাতক। আইআইটি খড়্গপুর ও আইএসএম ধানবাদে উচ্চতর শিক্ষা।
- ইসরো: চন্দ্রযান-৩ প্রকল্পে যুক্ত ।



অনুজ নন্দী

- বাড়ি: উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুরে
- পড়াশোনা: রায়গঞ্জ ইউনিভার্সিটি কলেজের পরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিদ্যায় স্নাতকোত্তর। পরে, এম টেক এবং পিএইচ ডি-ও করেছেন।
- ইসরো: চন্দ্রযান ৩-এর 'ল্যান্ডার'কে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে যে 'প্রোপালশন মডিউল পে-লোড', তার গায়ে 'স্পেকট্রো-পোলামেট্রি অব হ্যাবিটেবল প্ল্যানেট আর্থ' (সংক্ষেপে 'শেপ') নামে যন্ত্র নির্মাণের দায়িত্বে।

পীযূষকান্তি পট্টনায়ক

- বাড়ি: পূর্ব মেদিনীপুরের উত্তর কাটালে
- পড়াশোনা: কল্যাণী সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বি-টেক, খড়্গপুর আইআইটি থেকে এম-টেক।
- ইসরো: চন্দ্রযান ৩-এর তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখার দায়িত্বে

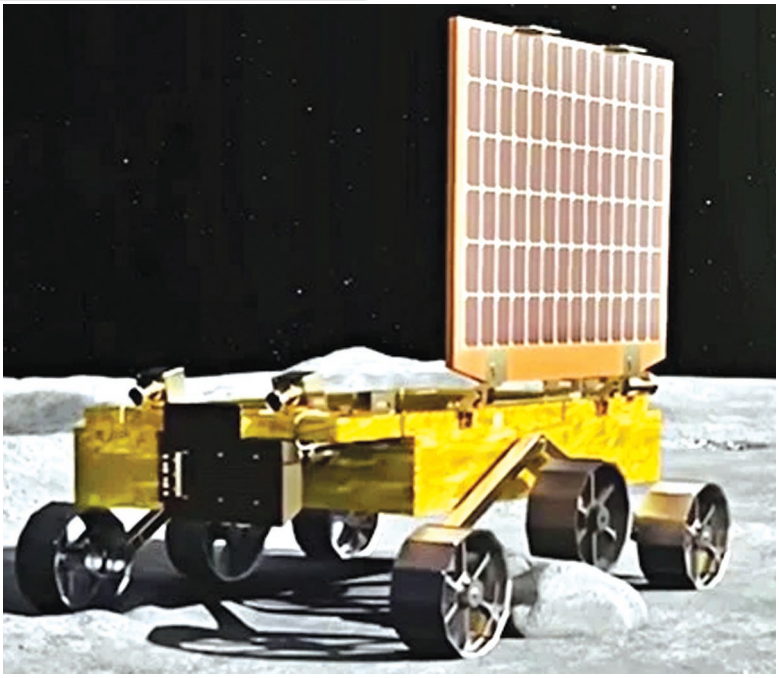


ইসরোর কন্ট্রোল রুমে ব্যস্ত পীযূষকান্তি পট্টনায়ক।



কৌশিক নাগ

- বাড়ি: জলপাইগুড়ি
- পড়াশোনা: জলপাইগুড়ি সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে পড়েন
- ইসরো: চন্দ্রযান-৩-এর সফটওয়্যার অপারেশনে যুক্ত



চাঁদের মাটিতে ভারতের 'বিক্রম' এক নতুন ইতিহাসের সূত্রপাত

অংশুমান গঙ্গোপাধ্যায়

১৪ জুলাই, ২০২৩ তারিখে চন্দ্রাভিযানের লক্ষ্যে মহাকাশে পাড়ি দেয় ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নির্মিত চন্দ্রযান-৩। ২১ আগস্ট থেকেই শুরু হয়ে যায় শেষ কাউন্টডাউন। ইসরোর ঘোষণা অনুযায়ী ৪০ দিন দীর্ঘ যাত্রার পর ২৩ আগস্ট, ২০২৩ তারিখে চন্দ্রযান-৩ এর অন্তর্গত ল্যান্ডার বিক্রম সন্ধ্যে ৬টা বেজে ৪ মিনিটে চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করবে বলে পূর্বনির্ধারিত ছিল। এই ঐতিহাসিক অবতরণের আগে চাঁদের কক্ষপথে ভ্রাম্যমাণ চন্দ্রযান-২ এর অরবিটারের সঙ্গে চন্দ্রযান-৩ এর ল্যান্ডার মডিউলের সফল যোগ স্থাপন হয়। চন্দ্রযান-৩ এর বিক্রম ল্যান্ডার চাঁদের নিকটবর্তী হতে থাকার সঙ্গে এতে থাকা ল্যান্ডার হ্যাজার্ড ডিটেকশন অ্যান্ড অ্যাভয়েডেন্স ক্যামেরা রহস্যময় চন্দ্রপৃষ্ঠের নানা মুহূর্তের ছবি তুলে ইসরোকে পাঠাতে থাকে। এই ক্যামেরার কাজ ছিল চাঁদে অবতরণের জন্য বড়ো পাথর বা গভীর গর্তহীন একটি সুরক্ষিত স্থান খুঁজতে সাহায্য করা। প্রসঙ্গত, ২০ আগস্ট চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণের সময়ে ভেঙে টুকরো হয়ে গিয়েছিল রুশ চন্দ্রযান লুনা-২৫। চন্দ্রযান-৩ এর পাঠানো ছবি থেকে দেখা গেছিল যে গর্তে ভরা অসমান জমি রয়েছে চাঁদের দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে। তাই যে কোনো পরিস্থিতিতে এই ল্যান্ডিং ছিল ইসরোর বিজ্ঞানীদের কাছে একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ।

ব্যাঙ্গালোরের ইন্ডিয়ান ইনস্টিউট অব সায়েন্সের বিজ্ঞানী রাধাকান্ত পাটি চন্দ্রযান-২ ও ৩ দুটি প্রকল্পের সঙ্গেই যুক্ত। তিনি জানান যে চন্দ্রযান-২ এর ল্যান্ডার বিক্রম তার গতি নিয়ন্ত্রণ না করতে পারার কারণে চাঁদের মাটিতে ক্র্যাশ করে। কিন্তু চন্দ্রযান-৩ এর বিক্রম ল্যান্ডারে যে অভ্যন্তরীণ স্যালভেজ মোড আছে, তা খুবই শক্তিশালী। চন্দ্রযান-২ এর ল্যান্ডারের 'অ্যালগরিদম্ ত্রুটি' চন্দ্রযান-৩ এর ল্যান্ডারের ক্ষেত্রে সংশোধন, চন্দ্রযান-৩ এর নিখুঁত নকশা তৈরি ছাড়াও অনেক খুঁটিয়ে করা চন্দ্রযান-৩ এর স্ট্রেস পরীক্ষার কারণে বিজ্ঞানীমহল যে কোনো সমস্যা বা ত্রুটি হলেও চন্দ্রপৃষ্ঠে চন্দ্রযান-৩ এর সফল অবতরণের বিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন। যদি গতিবেগে কোনো গোলমাল হয় বা এই কারণে নামতে দেরি হয়, সেই জন্য চন্দ্রযান-৩-এ অতিরিক্ত জ্বালানির



অশ্বিন ভাসাভাদাকে সম্প্রতি নাসার মার্স রোভার কিউরিওসিটির জন্য প্রজেক্ট সায়েন্টিস্ট মনোনীত করা হয়েছে, যার ফলে তাকে বিশ্বজুড়ে প্রায় ৫০০ গবেষকের একটি দলের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ভাসাভাদা তার অভিজ্ঞতার দ্বারা, নাসা পরিচালিত বৃহস্পতিতে গ্যালিলিও মিশন, শনি গ্রহে ক্যাসিনি মিশন, মার্স পোলার ল্যান্ডার এবং মার্স ওডিসি-র মতো বেশ কয়েকটি মহাকাশযান মিশনেরও একটি অংশ ছিলেন এবং তার নতুন চ্যালেঞ্জিং ভূমিকা নিয়ে তিনি উচ্ছ্বসিত। **শর্মিলা ভট্টাচার্য** মহাকাশ মানবদেহ নিয়ে গবেষণা করছেন। তিনি নাসা আমেস রিসার্চ সেন্টারে (NASA Ames Research Centre) স্পেস বায়ো-সায়েন্সেস ডিভিশনের বায়োমডেল পারফরম্যান্স ল্যাবরেটরিতে গবেষণা পরিচালক।



সুনীতা উইলিয়ামস, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মহিলা মহাকাশ-চারীদের তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন। তিনি দুটি আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন ভ্রমণের মহাকাশচারী। এখন নাসার মনুষ্য মঙ্গল মিশনের অংশ। যদিও তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং বড়ো হয়েছিলেন। ২০১৩ সালে ভারত সফরের সময় তিনি বলেছিলেন ভারত এবং তার প্রভাব সবসময়ই তার হৃদয়ের কাছাকাছি। তিনি উপনিষদের একটি অনুলিপি এবং ভগবদ্গীতার একটি অনুলিপি মহাকাশে নিয়ে গিয়েছিলেন।

সংস্থান রাখা হয়। পূর্ব নির্দিষ্ট স্থানের পরিবর্তে প্রয়োজনে বিকল্প কোনো স্থানেও অবতরণে সক্ষম ছিল ল্যান্ডার বিক্রম। ল্যান্ডারে ছিল নতুন সেন্সর যার নাম লেজার ডপলার ভেলোসিটি মিটার। বিক্রমকে সফট্ ল্যান্ডিং বা পালকাবতরণে সাহায্য করার জন্য ছিল ৩টি ভেলোসিটি ভেক্টর ও ১৩টি থ্রাস্টার।

১৭ আগস্ট মূল মহাকাশযান বা চন্দ্রযান-৩ এর প্রোপালশন মডিউল থেকে ল্যান্ডার বিক্রম সফলভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ২২ আগস্ট চাঁদের মাটি থেকে ল্যান্ডারের দূরত্ব দাঁড়ায় ২৫ কিলোমিটার। এরপর ধীরে ধীরে কমিয়ে আনা হতে থাকে ল্যান্ডারের গতি। বিজ্ঞানীদের পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রথম ধাপে বিক্রমকে ৭.৪ কিলোমিটার দূরত্বে নামিয়ে আনা হয়। ওই সময়ে ল্যান্ডারের গতি ছিল সেকেন্ডে ৩৫৮ মিটার। দূরত্ব অতিক্রম করতে লাগে ১১ মিনিট। পরের ধাপে চাঁদের মাটি থেকে ৬.৮ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রমের সময় ল্যান্ডারের গতি দাঁড়ায় সেকেন্ডে ৩৩৬ মিটার। এরপর চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে বিক্রমের দূরত্ব কমে হয় ৮০০ মিটার। এই পর্যায়ে গতি আরও কমিয়ে চাঁদের দক্ষিণ মেরুর মাটিতে লেজার রশ্মি ফেলে সেন্সরের মাধ্যমে অবতরণের উপযুক্ত স্থান খুঁজতে থাকে বিক্রম। এরপর ৮০০ থেকে ১৫০ মিটার দূরত্বে চন্দ্রপৃষ্ঠে নামার পথে বিক্রমের গতি দাঁড়ায় সেকেন্ডে ৬০ মিটার। এরপর ১৫০ থেকে ৬০ মিটার দূরত্বে গতি দাঁড়ায় সেকেন্ডে ৪০ মিটার। ৬০ থেকে ১০ মিটার নামার সময়ে গতি- সেকেন্ডে ১৪



কল্পনা চাওলা মহাকাশে প্রথম ভারতীয় মহিলা। কলম্বিয়া শাটল মিশনে মহাকাশচারী কল্পনা চাওলার মতো কিছু নাম গত দু' দশকে ভারতীয়দের সম্মিলিত আবেগকে ধরে রেখেছে। কল্পনা পঞ্জাবের কারনালে জন্মগ্রহণ করেন এবং পঞ্জাব ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিঙে ডিগ্রি অর্জন করেন।



ড. কমলেশ লুল্লা, Remote Sensing-এর মাধ্যমে মহাকাশচারীদের নিরাপদে অবতরণে সহায়তা করছেন। জনসন স্পেস সেন্টারে ইউনিভার্সিটি রিসার্চ, কোলাবরেশন অ্যান্ড পার্টনারশিপ অফিসের পরিচালক নাসার সবচেয়ে বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের একজন। ভাদোদরায় জন্মগ্রহণকারী ড. লুল্লাকে বলা হয় যে তার অফিসের দেওয়াল পেইন্টের চেয়ে বেশি পুরস্কার দিয়ে ঢেকে গিয়েছে।



ড. মেয়া ময়াপ্পান, ভবিষ্যতের মহাকাশ অনুসন্ধানের জন্য ন্যানো প্রযুক্তি তৈরি করছেন। NASA Ames গবেষণা কেন্দ্রে অনুসন্ধান প্রযুক্তির প্রধান বিজ্ঞানী একজন ন্যানোটেকনোলজি বিশেষজ্ঞ, ড. মেয়া ময়াপ্পান পিয়ার-রিভিউড জার্নালে ২৭৫টিরও বেশি নিবন্ধ লিখেছেন এবং সহ-লেখক করেছেন। ২০১১ সালে IEEE পাইওনিয়ার পুরস্কার জিতেছেন।



এয়ারোস্পেস ইঞ্জিনীয়ার **ড. অনিতা সেনগুপ্ত** ল্যান্ডিং রোভারস তৈরি ও স্পেসক্র্যাফট ডিজাইন করছেন। তিনি নাসার জেট প্রপালশন ল্যাবরেটরিতে প্রকল্প ব্যবস্থাপক। বিজ্ঞান কল্পকাহিনি এবং কৌতূহলের প্রতি অনিতার শৈশব মুগ্ধতা তাকে জেট প্রপালশন ল্যাবরেটরিতে প্রজেক্ট ম্যানেজার হিসেবে কর্মজীবনে নিয়ে যায়। তিনি ৭০ ফুট প্যারাসুট ডিজাইন করে ছিলেন যা ২০১২ সালের মার্চ মাসে কিউরিওসিটি রোভারের মঙ্গল গ্রহে অবতরণকে নিরাপদ করে দিয়েছিল। কিন্তু তার সবচেয়ে উত্তেজনাপূর্ণ সাফল্য এসেছে বোস-আইনস্টাইন কনডেনসেট নামক পদার্থের অবস্থা তৈরিতে, যা শীঘ্রই আন্তর্জাতিকভাবে আত্মপ্রকাশ করবে।



ড. মধুলিকা গুহঠাকুরতা সূর্যের বিষয়ে বিশ্বের প্রথম মিশনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তিনি ভারতে জন্মগ্রহণ করেন এবং দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জ্যোতির্পদার্থবিদ্যায় স্নাতকোত্তর এবং পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। হেলিওফিজিক্সে সূর্যের অধ্যয়ন এবং নাসাতে সৌরজগতে এর প্রভাবের কারণের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য তিনি সবচেয়ে বিখ্যাত। তার নির্দেশনা ও নেতৃত্বে একটি নিবেদিত সোলার প্রোগ্রাম তৈরি করা হচ্ছে।



ড. সুরেশ বি কুলকার্নি, ৫৫টি সফল নাসা রকেট লঞ্চের জন্য 'রকেট ম্যান' হিসেবে বিখ্যাত। আইআইটি খড়্গপুরের স্নাতক যিনি ২০০৩ সাল পর্যন্ত বেসরকারি কোম্পানি থিওকোলের সঙ্গে কাজ করেছেন। তিনি বিল ক্লিনটনের স্পেস লঞ্চ ব্রড এরিয়া রিভিউতেও ছিলেন, সেই সঙ্গে ইন্টারকন্টিনেন্টাল ব্যালিস্টিক মিসাইল সিস্টেম-সহ উদ্যোগের জন্য বেশ কয়েকটি রকেট এবং মিসাইল উপাদান ডিজাইন করেছেন। সাকার হতে চলেছে সেই বিখ্যাত ভবিষ্যদ্‌বাণী— 'বল বল সবে শত বীণা বেনু রবে ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।'

মিটার। শেষ ধাপে চাঁদের মাটিতে ল্যান্ডারের বহু প্রতীক্ষীত সফট্ ল্যান্ডিং; শেষ মুহূর্তে তার গতিবেগ সেকেন্ডে ১.৬৮ মিটার। নির্ধারিত সময়ের প্রায় ১ মিনিট আগে সন্ধ্যা ৬টা বেজে ৩ মিনিট কয়েক সেকেন্ড পরেই চাঁদের মাটিতে পা রাখলো ভারতের চন্দ্রযান-৩!

উচ্ছ্বাসে মেতে উঠলো গোটা দেশ! ইসরোর চেয়ারম্যান এস সোমনাথ-সহ অন্য বিজ্ঞানীরা উচ্ছ্বাসে মেতে উঠলেন এবং সংবাদমাধ্যমের সমীপে চন্দ্রযান-৩ এর সফল অবতরণের ঘোষণা করলেন। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে সব বিজ্ঞানীদের অভিনন্দন জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আমেরিকা, রাশিয়া, চীনের পর চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণের ক্ষেত্রে ভারত চতুর্থ স্থান অর্জন করে। যদিও চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে প্রথম অবতরণকারী দেশ হলো ভারত। ২৬ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী ইসরোর সদর দপ্তর টেলিমেট্রি ট্র্যাকিং অ্যান্ড কমান্ড নেটওয়ার্ক মিশন কন্ট্রোল কমপ্লেক্সে পৌঁছে চাঁদের যে অংশে ল্যান্ডার বিক্রমের সফল অবতরণ হয়েছে, সেই অবতরণ স্থলের নামকরণ করেন 'শিবশক্তি'। ২০১৯ সালে চন্দ্রযান-২ চন্দ্রপৃষ্ঠের যে স্থানে ভেঙে পড়ে, তার নামকরণ করেন 'তেরঙা'। রীতিমতো কাঁটা-কম্পাস মেপে বিক্রম অবতরণের পর তার অভ্যন্তর থেকে ৬টি চাকা যুক্ত সৌরশক্তি পরিচালিত, ১৪ দিন আয়ুবিশিষ্ট ২৬ কিলোগ্রাম ওজনের রোভার 'প্রজ্ঞান' বেরিয়ে আসে।

বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য এই রোভারটি একাধিক পেলোড বা যন্ত্র বিশিষ্ট। এপিএক্সএস (আলফা পার্টিকল্ এক্স-রে স্পেকট্রোমিটার) যা চন্দ্রপৃষ্ঠের খনিজ সম্পদ ও রাসায়নিকের গঠনগত বিশ্লেষণ, এলআইবিএস (লেজার ইনডিউসড্ ব্রেকডাউন স্পেকট্রোস্কোপ) যা চাঁদের মাটিতে ও পাথরে উপস্থিত বিভিন্ন মৌলের অনুসন্ধান করবে। রেডিও অ্যানাটমি অব মুনবাউন্ড হাইপারসেন্সিটিভ আয়নো-স্ফিয়ার অ্যান্ড অ্যাট- মোস্ফিয়ার-ল্যাংমুয়ার প্রোব (র‍্যামবিএইচ-এলপি) চন্দ্রপৃষ্ঠে বিভিন্ন আয়ন-ইলেকট্রনের প্লাজমা ঘনত্ব ও সময়ের সঙ্গে সেই ঘনত্বের পরিবর্তন বিশ্লেষণ করবে।

এছাড়াও, চন্দ্রপৃষ্ঠে বিক্রমের দুটি বিশেষ সেন্সর সক্রিয় রয়েছে- চান্দ্র সিসমিক অ্যাক্টিভিটি পরীক্ষার জন্য 'ইনস্ট্রুমেন্ট ফর লুনার সিসমিক অ্যাক্টিভিটি' (আইএলএসএ) এবং চন্দ্রপৃষ্ঠের তাপীয় পদার্থবিদ্যাগত পরীক্ষার প্রয়োজনীয় 'চন্দ্র সারফেস থার্মোফিজিক্যাল এক্সপেরিমেন্ট' (চেস্ট)। ২৩ আগস্টের পর থেকে 'শিবশক্তি' বলে চিহ্নিত স্থানে ঘোরাফেরা শুরু করে প্রজ্ঞান। প্রচুর গর্ত, পাথর ও ঢিবি সংবলিত সেই স্থানে চলতে গিয়ে ২৮ আগস্ট প্রজ্ঞান ৪ মিটার ব্যাসের একটি গর্তের সম্মুখীন হয়।

ইসরো ট্যুইটার হ্যান্ডেলে জানায় যে প্রজ্ঞানের অবস্থানের চেয়ে ৩ মিটার দূরে গর্তটি দেখা যায়। তখন রোভারটিকে সেখান থেকে সরিয়ে আনা হয়। সূর্যের আলোয় শক্তি সংগ্রহ করে কাজ করার কারণে ২৩ আগস্ট থেকে ১৪ দিন বা এক চন্দ্র দিবস পর্যন্ত চাঁদে কর্মক্ষম থাকবে প্রজ্ঞান ও বিক্রম। প্রজ্ঞানের গতি সেকেন্ডে মাত্র ১ সেন্টিমিটার। এতে রয়েছে একাধিক দিকনির্দেশক বা নেভিগেশন ক্যামেরা। চাঁদের মাটির উষ্ণতাও মাপে রোভার প্রজ্ঞান। সেই উষ্ণতার গ্রাফ প্রকাশ করে ইসরো দেখিয়েছে চাঁদের মাটি থেকে ২০ মিলিমিটার গভীরে উষ্ণতা ৩০-৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

গত ২৫ আগস্ট ইসরো জানায় যে প্রায় ৮ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করেছে প্রজ্ঞান। যে কটি দিন চন্দ্রপৃষ্ঠে সূর্যালোক থাকবে, নিজের মতো করে ছবি ও তথ্য সংগ্রহ করবে প্রজ্ঞান।

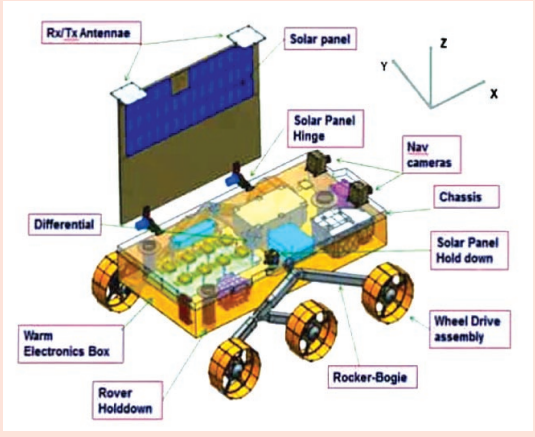
এপিএক্সএস ও এলআইবিএস- এই দুটি পেলোডকে সক্রিয় করার মাধ্যমে প্রজ্ঞান চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে সালফার, আয়রন, সিলিকন, ম্যাঙ্গানিজ, টাইটানিয়াম, ক্যালসিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম, ক্রোমিয়াম ছাড়াও অক্সিজেনের সন্ধান পেয়েছে। এখন হাইড্রোজেনের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে প্রজ্ঞান। তা মিললে চাঁদে জলের অস্তিত্ব প্রমাণিত হবে। 'নেভিগেশন ক্যামেরা অনবোর্ড দ্য রোভার'-এর সাহায্যে ল্যান্ডার বিক্রমের ছবি তোলে রোভার প্রজ্ঞান, যাকে 'ইমেজ অব দ্য মিশন' বলে সম্প্রচার করেছে ইসরো। পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার মছলন্দপুরের নীলাদ্রি মৈত্র, পাঁশকুড়ার ঘোষপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর কাঁটাল গ্রামের পীযূষ পট্টনায়েক, বাঁকুড়ার পাত্রসায়র ব্লকের ডান্না গ্রামের কৃশানু নন্দী সহ ইসরোর একাধিক বাঙ্গালি বিজ্ঞানী এই চন্দ্রযান-৩ প্রকল্পে তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক অমিতাভ গুপ্ত এবং ইলেকট্রনিক্স ও টেলিকমিউকেশন বিভাগের অধ্যাপক সায়ন চট্টোপাধ্যায় ইসরোর কোর টিমের সদস্য না হলেও চন্দ্রযান-৩ এর সহযোগী প্রকল্পে যুক্ত ছিলেন।

২০১৮ সালের ১৫ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী মোদীজীর ঘোষণা অনুযায়ী আগামীদিনে তিন ধাপে 'গগনযান প্রকল্প' বাস্তবায়িত করবে ইসরো। প্রথম ধাপে মানব বিহীন মহাকাশযান পাঠানো হবে। সেখানে সাফল্য পেলে দ্বিতীয় ধাপে মহাকাশযানে পাঠানো হবে হিউম্যানয়েড রোবট 'ব্যোম মিত্র'কে। এই পর্যায়ে সাফল্য পেলে শেষ পর্যায়ে মহাকাশে পাঠানো হবে ৩ মহাকাশচারীকে। এই প্রকল্প ব্যয় ৯,০২৩ কোটি টাকা। এছাড়াও, চন্দ্রযান-৩এর পর ভারত-জাপান যৌথ উদ্যোগে লুনার পোলার এক্সপ্লোরেশন মিশন, সূর্য সংক্রান্ত গবেষণায় আদিত্য এল-১ স্যাটেলাইট, লালগ্রহ মঙ্গলে মঙ্গলযান-২ ও ২০৩১ সালে শুক্র মিশনের জন্য শুক্র যানের গবেষণা প্রকল্পের বাস্তবায়ন ইসরোর পরিকল্পনাধীন। ■

চন্দ্রযান-৩ এর সফল অবতরণ
নতুন ভারতের অগ্রগতির পদক্ষেপ

ডঃ জয়ন্ত রায়চৌধুরী

গত ২৩ আগস্ট বিকেল ৫-২৫ মিনিট থেকে আপামর ভারতবাসীর চোখ টিভি-র পর্দায় বা মোবাইলে ইসরোর ওয়েবসাইটে নিবদ্ধ ছিল। আশা-আশঙ্কার দোলাচলে টানটান উত্তেজনা। একটু একটু করে চন্দ্রায়ন–৩ অভিযানের ল্যান্ডার বিক্রম চন্দ্রপৃষ্ঠের দিকে নামছে। প্রতি মুহূর্তে তার উচ্চতা কমছে, অনুভূমিক বেগ (Horizontal Velocity) ও উল্লম্ব বেগ (Vertical Velocity) কমার ঘোষণা চলছে। একসময় অনুভূমিক বেগ প্রায় শূন্য হয়ে গেল এবং খাড়া (উল্লম্ব) অবতরণ শুরু হলো। ১৫০ মিটার উচ্চতায় অনুভূমিক ও উল্লম্ববেগ প্রায় শূন্য হয়ে গেল। পূর্ব ঘোষণা মতো ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে ঠিক সন্ধ্যা ৬-০৪ মিনিটে বিক্রম সফ্‌ট্ ও সেফ্ ল্যান্ডিং করল চাঁদের দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে। পৃথিবীর চতুর্থ দেশ হিসেবে ভারত এই গৌরবের অধিকারী হলো। তার চেয়ে বড়ো কথা এই যে, প্রথম দেশ হিসেবে বিপদসঙ্কুল চাঁদের দক্ষিণ মেরুর কাছাকাছি অঞ্চলে (৬৯.৩৭° সাউথ অক্ষাংশ ও ৩২.৩৫° ইস্ট দ্রাঘিমাংশে) ভারত সফল হলো যা অন্য কোনো দেশই করে উঠতে পারেনি। রাশিয়া অনেক বেশি খরচ করে লুনা-২৫ চন্দ্রযানকে অনেক কম সময়ে চাঁদের কক্ষপথে পৌঁছেও দিয়েছিল। রস্‌কস্‌মসের ঘোষণা অনুযায়ী একদিন আগেই চাঁদের দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে ২২ আগস্ট অবতরণ করার কথা ছিল। কিন্তু শেষরক্ষা হলো না। চাঁদের বুকে লুনা-২৫ এর ল্যান্ডার আছড়ে পড়ে ধ্বংস হয়ে গেল। ফলে ভারতই চাঁদের দক্ষিণ মেরু জয়ের গৌরবের অধিকারী হলো। একটা কথা মনে রাখতে হবে যে এই রাশিয়া কিন্তু সেই মহাশক্তিধর সোভিয়েত ইউনিয়নের বৃহত্তম ও শক্তিশালী উত্তরসূরী। সোভিয়েত ইউনিয়নের লুনা-২ চন্দ্রযান চাঁদের মাটিতে (অবশ্যই বিষুব অঞ্চলে) ১৯৫৯ সালে আমেরিকা- সহ সকল দেশের আগে চাঁদের মাটিতে অবতরণ করেছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের অস্তিত্বকালে লুনা-২৪ ছিল শেষ চন্দ্রাভিযান। ৪৭ বছর পর রাশিয়া লুনা-২৫ অভিযানে ব্যর্থ হলো। চাঁদের দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে চন্দ্রযান-২- এর ল্যান্ডার বিক্রমের অবতরণের চেষ্টা চার বছর আগে আমাদেরও একেবারে শেষ মুহূর্তে চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে মাত্র ২.১ কিমি উচ্চতায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে ব্যর্থ হয়েছিল। যদিও চন্দ্রযান-২-এর অরবিটার আজও কাজ করে চলেছে। এইজন্য এবার চন্দ্রযান-৩ মিশনে অরবিটার পাঠানো হয়নি। চন্দ্রযান-২-এর আংশিক ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিয়ে চন্দ্রযান-৩-এর ল্যান্ডার বিক্রমের নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছিলেন ইসরোর বিজ্ঞানীরা যাতে সফ্‌ট্ ল্যান্ডিং নিশ্চিত হয়।



চন্দ্রযান-২-এর ল্যান্ডারের ব্যর্থতার দিনে তদানীন্তন ইসরোর চেয়ারম্যার যখন কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন, সেদিনের সেই বিষাদঘন মুহূর্তে ইসরোর সদর দপ্তরে উপস্থিত হয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজীর কে. শিবনকে বুকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দেওয়ার ছবি সকলের মনের মণিকোঠায় অক্ষয় হয়ে রয়েছে। এবারও ২৩ আগস্ট এই বিশ্বজয়ের দিনটিতে BRICS সম্মেলনে উপস্থিতির জন্য দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকাকালীন প্রধানমন্ত্রী জোহানেস্‌বার্গ থেকে ভার্চুয়ালি জুড়েছিলেন ইসরোর শতাধিক বিজ্ঞানী এবং তাঁর প্রিয় দেশবাসীর সঙ্গে। সকলের সঙ্গে তিনিও কয়েক হাজার কিলোমিটার দূর থেকে এই গর্বের মুহূর্ত প্রত্যক্ষ করেছেন। করতালি দিয়ে, জাতীয় পতাকা আন্দোলিত করে বিজ্ঞানীদের প্রোৎসাহিত করেছেন। সেই মাহেন্দ্রক্ষণে ইসরোর বিজ্ঞানীদের সঙ্গে সকল ভারতবাসী উচ্ছ্বাসে ভেসে গিয়েছিলেন। কারও কারও চোখে ছিল আনন্দাশ্রু। ইসরোর সদর দপ্তরে উপস্থিত বিজ্ঞানীদের উচ্ছ্বাস, জাতীয় পতাকা নিয়ে উন্মাদনা ও জয়ঘোষ আমরা সকলে প্রত্যক্ষ করেছি। ভারতবাসীদের সঙ্গে অনাবাসী ভারতীয়রা এবং বহু বিদেশিও সাক্ষী থেকেছেন এই ঐতিহাসিক মুহূর্তের। ল্যান্ডার বিক্রমের চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণের অব্যবহিত পরেই এই অভিযানের মুখ্য কারিগরদের সঙ্গে নিয়ে ইসরো প্রধান এস. সোমনাথ মঞ্চে উঠে প্রধানমন্ত্রীকে সম্বোধন করে বললেন, ''Sir we have achieved soft landing. India is on the moon''। এরপর উনি প্রধানমন্ত্রীকে বক্তৃতা দিতে অনুরোধ করলেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁর প্রেরণাদায়ী বক্তব্যে এই যুগান্তকারী ঐতিহাসিক সাফল্যকে 'বিকশিত ভারতের শঙ্খনাদ', 'নতুন ভারতের জয়ঘোষ', 'ভারতের উদীয়মান ভাগ্যের আহ্বান' ইত্যাদি অভিধায় অভিহিত

করলেন। বৈজ্ঞানিকদের পরিশ্রম ও প্রতিভায় ভারত চন্দ্রপৃষ্ঠের দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে পৌঁছেছে, যেখানে পৃথিবীর কোনো দেশ আজও পৌঁছতে পারেনি। তিনি ভারতের এই সাফল্যকে বিশ্বের সাফল্য হিসাবে তুলে ধরেন। আমরা পৃথিবীকে এক পরিবার মনে করি ও সকলের এক ভবিষ্যতে বিশ্বাসী। আমাদের এই মানবকেন্দ্রিক অভিমুখ অনুযায়ী এই সাফল্য সমগ্র বিশ্বের সাফল্য। তিনি সকলকে উৎসাহিত করলেন আরও একটি বাক্য দিয়ে, ''Sky is not the limit''। ইসরোর আগামী অভিযানগুলি যেমন—আদিত্য এল-১ মিশন (সূর্য সংক্রান্ত পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য মহাকাশ যান), মহাকাশে মানুষ পাঠানোর জন্য গগনযান মিশন ও শুক্র অভিযানের উল্লেখ করেছেন। তাঁর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে মহাকাশ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নতুন ভারতের অভূতপূর্ব অগ্রগতির অভিমুখ নির্দেশিত হলো যা এই প্রতিবেদনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। প্রধানমন্ত্রী সেদিন ফোনেও এস. সোমনাথ ও অন্য বিজ্ঞানীদের অভিনন্দন জানান এবং দেশে ফিরেই ইসরো কার্যালয়ে পৌঁছে যাওয়ার কথা দেন। সেই অনুযায়ী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে সরাসরি ইসরো কার্যালয়ে গিয়ে বিজ্ঞানীদের অভিনন্দিত করেন। তিনি বিক্রমের অবতরণ স্থানকে 'শিবশক্তি পয়েন্ট' এবং চন্দ্রযান-২ এর ল্যান্ডারের হার্ড ল্যান্ডিং স্থানকে 'তেরঙ্গা পয়েন্ট' নামে অভিহিত করেন।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত কঠোর পরিশ্রম থেকে প্রাপ্ত এই মাহেন্দ্রক্ষণ এনে দেওয়ার জন্য বিজ্ঞানীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন এবং এঁদের প্রোৎসাহন দেওয়া সরকার-প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানান। তিনি আর বলেন, ''ভারত উঠবে, পুরো দুনিয়াকে নিয়েই উঠবে।

এই বিবরণ থেকে আমরা বুঝতে পারব যে কীভাবে আমরা অনেক কম ব্যয়ে চাঁদে পৌঁছলাম। চীনের (যারা কম ব্যয়ে উৎপাদনে সিদ্ধহস্ত) চ্যাং-৫ চন্দ্রযান পাঠাতে যে খরচ হয়েছিল তার বর্তমান মূল্যের এক চতুর্থাংশের কম ব্যয়ে (৬১৫ কোটি টাকা) চন্দ্রযান-৩ অভিযান সম্পন্ন হয়েছে। আমেরিকা, রাশিয়া ও চীনের মতো অনেক বেশি জ্বালানিযুক্ত শক্তিশালী রকেট ব্যবহার করে ৪ দিনে চাঁদে না পৌঁছে, পৃথিবীর ও চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ ব্যবহার করে ৪০দিনে চন্দ্রযান-৩ চাঁদে পৌঁছেছে। এর ফলেই এত স্বল্প ব্যয়ে এই অভিযান সম্ভব হয়েছে। গত ১৪ জুলাই ২০২৩, শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান উৎক্ষেপণ মঞ্চ থেকে এলভিএম-৩ রকেটের সাহায্যে চন্দ্রযান-৩ কে উৎক্ষেপণ করা হয়। এই চন্দ্রযানে তিনটি অংশ—ল্যান্ডার বিক্রম (ইসরোর প্রাণপুরুষ বিক্রম সারাভাইয়ের নাম অনুসারে) , বিক্রমের অভ্যন্তরে রোভার প্রজ্ঞান ও প্রপাল্‌শন্‌ মডিউল (যা চাঁদে পৌঁছতে সাহায্য করবে)। এলভিএম–৩ রকেট চন্দ্রযান–৩ কে ১৭০ কি.মি. × ৩৬৫০০ কিমি-র উপবৃত্তাকার (ডিম্বাকার) কক্ষপথে স্থাপন করে। ওই কক্ষপথের Perigee (পৃথিবীর কাছাকাছি বিন্দু)-তে ম্যানুয়েভার করে (বুস্ট) উচ্চতর কক্ষপথে পৌঁছানো হয়। এইভাবে ক্রমান্বয়ে চারটি কক্ষপথের পর পঞ্চম কক্ষপথে (২৫০ কি.মি. × ১,২৭,০০০ কি.মি.) চন্দ্রযান-৩-কে নিয়ে আসা হলো। এই কক্ষপথের perigee থেকে বুস্ট করে চন্দ্রযান-৩-কে লুনার ট্রান্সফার ট্রাজেক্টোরি বারবার চন্দ্রাভিমুখে পাঠানো হলো। চাঁদের কাছাকাছি যাওয়ার পর ম্যানুয়েভার করে (এক্ষেত্রে ডি বুস্ট করে) চাঁদের চারপাশে উপবৃত্তাকার বড় কক্ষপথে স্থাপন করা হয়। এরপর ডিবুস্ট করে ওখানে ও ৫টি ক্রমাগত ছোট কক্ষপথে নিয়ে আসা হয়। পঞ্চম কক্ষপথটি প্রায় বৃত্তাকার ছিল। এই কক্ষপথেই প্রপালশন্‌ মডিউল থেকে ল্যান্ডারকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। এরপরের ধাপে বিক্রম মডিউলের এঞ্জিন ব্যবহার করে ল্যান্ডিং পূর্ব কক্ষপথে (প্রায় ১৫০ কি.মি. × ২৫ কিমি) স্থাপন করা হয়। এই কক্ষপথ থেকেই ২৩ আগস্ট চন্দ্রপৃষ্ঠের power desent (অবতরণ) শুরু হয়। প্রথমে হয় রাফ ব্রেকিং ও চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৬ কিমি উচ্চতা থেকে ৮০০ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত ফাইন ব্রেকিং। এরপর বিক্রমের নেভিগেশন সিস্টেম কাজে লাগিয়ে সঠিক স্থান নির্বাচন করে শুরু হলো উল্লম্ব অবতরণ (vertical descent)। ১৫০ মিটার উচ্চতায় অনুভূমিক ও উল্লম্ব উভয় বেগই প্রায় শূন্য হয়ে গেল। অবতরণের শেষ পর্যায়ের বর্ণনা প্রবন্ধের শুরুতেই করা হয়েছে।

বিক্রমের অবতরণের প্রায় ৬ ঘণ্টা পরে বিক্রমের অভ্যন্তর থেকে নভতল বরাবর বেরিয়ে এল রোভার প্রজ্ঞান। বিক্রম অবতরণ স্থানে ও প্রজ্ঞান প্রায় ৫০০ মি. দূরত্ব পর্যন্ত চাঁদের দক্ষিণমেরু অঞ্চলে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাচ্ছে। এই পরীক্ষা-পর্যবেক্ষণ পৃথিবীর ১৪ দিন তথা চাঁদের একদিন পর্যন্ত চলবে। কারণ তারপর নেমে আসবে চাঁদের বুকে অতি শীতল রাত। ওই অঞ্চলের উষ্ণতা তখন নেমে আসবে হিমাঙ্কের ২০০° C নীচে, যে উষ্ণতায় বিক্রম ও প্রজ্ঞানের যন্ত্রাদি তথা সফট্‌ওয়ার ও হার্ডওয়ার কার্যক্ষম থাকার কথা নয়। অবতরণের পরেই বিক্রম চন্দ্রপৃষ্ঠের ছবি পাঠিয়েছে। প্রজ্ঞানও একটি চার মিটার ক্রেটার (গর্ত)-এর সামনে পৌঁছে ছবি পাঠানোয় তাকে ফিরিয়ে এনে ভিন্ন পথে চালনা করা গেছে। প্রসঙ্গত, প্রজ্ঞানের সঙ্গে গ্রাউন্ড কন্ট্রোলের সরাসরি যোগাযোগ নেই। যোগাযোগ হয় বিক্রমের মাধ্যমে। প্রজ্ঞান আবার বিক্রমের সাদা-কালো ছবি পাঠিয়েছে। ইতিমধ্যেই বিক্রম ও প্রজ্ঞানের কতগুলি যুগান্তকারী পর্যবেক্ষণ পাওয়া গেছে। বিক্রমে থাকা যন্ত্র CHASTE (যা চন্দ্রপৃষ্ঠে ১০ সেমি গর্ত করতে সক্ষম) চন্দ্রপৃষ্ঠে গভীরতার সঙ্গে তাপমাত্রার তারতম্য মেপে বিস্ময়কর পর্যবেক্ষণ ইসরোকে পাঠিয়েছে। যেখানে চন্দ্রপৃষ্ঠে উষ্ণতা প্রায় ৫০°C সেখানে গভীরতার সঙ্গে তাপমাত্রা কমে ৮ সেমি গভীরতায় প্রায় –১০°C পাওয়া গেছে। যা কি চন্দ্রপৃষ্ঠের নিচে বরফের অস্তিত্বের ইঙ্গিত দিচ্ছে? সময় এর উত্তর বলবে।

অন্য একটি যন্ত্র Rambha-LP চাঁদের দক্ষিণ মেরুর পরিমণ্ডলে প্লাজমা কণার উপস্থিতি নিশ্চিত করেছে। যার ফল বিভিন্ন দেশের চন্দ্র মিশন কাজে লাগাতে পারবে। অপর যন্ত্র ILSA ChaSTE-র গর্ত করা, প্রজ্ঞানের চলাফেরার কম্পনের সঙ্গে অন্য একটি প্রাকৃতিক কম্পন হতে পারে। রোভার প্রজ্ঞান ও চন্দ্রপৃষ্ঠে খনিজ উপাদান বিশ্লেষণের এযাবৎ যা তথ্য পাঠিয়েছে তাতে অ্যালুমিনিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, ক্যালসিয়াম লোহা, ক্রোমিয়াম, সিলিকন, টাইটেনিয়াম ও অক্সিজেন (অবশ্যই অক্সাইড রূপে)-এর উপস্থিতি পাওয়া গেছে। পর্যবেক্ষণ আরও কিছুদিন চলবে ও আর তথ্য আসার সম্ভাবনা আছে। এইসব তথ্য বিশ্লেষণের ফলে অর্জিত জ্ঞানের সাহায্যে শুধু ভারত নয়, সারা বিশ্বের বিজ্ঞান মহল উপকৃত হবে। ■



দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা

কানু রঞ্জন দেবনাথ

ভাদ্র মাসের শেষ দিন বা সংক্রান্তিতে বিশ্বকর্মা পূজা হয়ে থাকে। ভাদ্র মাসের আগের আষাঢ়-শ্রাবণ মাস বর্ষার তুমুল মরসুম। এই সময় কোনো কাজ বা নির্মাণ কার্য করা যায় না। ভাদ্র-আশ্বিন মাসে ঝড়-বৃষ্টির প্রাবল্য থাকে না। তাই মানুষ বা কারিগরেরা বা শ্রমিকেরা নির্মাণ শিল্পের স্রষ্টা তথা গুরু বিশ্বকর্মাকে স্মরণ করে তাঁর পুজো করে কর্মযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়েন। কোনো কোনো অঞ্চলে অক্টোবর-নভেম্বর মাসে দীপাবলীর একদিন পরে গোবর্ধন পূজার সঙ্গেও বিশ্বকর্মা পুজো হয়ে থাকে।

কেন প্রতি বছর একই দিনে পড়ে বিশ্বকর্মা পূজা? সব দেব-দেবীর পূজার তিথি স্থির হয় চন্দ্রের গতিপ্রকৃতির উপর ভিত্তি করে বা চন্দ্রবর্ষ অনুসারে, কিন্তু শুধুমাত্র বিশ্বকর্মার পূজার তিথি স্থির হয় সূর্যের গতি প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে বা সৌরবর্ষ অনুসারে। যখন সূর্য সিংহ রাশি থেকে কন্যা রাশিতে গমন করে, সেই সময় বিশ্বকর্মার পূজার আয়োজন করা হয়। এই বিশেষ দিনটি ভারতীয় সৌর বর্ষপঞ্জি এবং বঙ্গাব্দে ভাদ্র মাসের শেষ দিন। এই ভাদ্র সংক্রান্তির আগেই বাংলা পঞ্জিকাতে ৫ মাসের উল্লেখ মেলে,— যার দিনসংখ্যা মোট ১৫৬ দিন। তাই বিশ্বকর্মা পূজার বাংলা তারিখটি ইংরেজি ক্যালেন্ডারের ১৭ সেপ্টেম্বর পড়ে।

কোনো কোনো বছর উল্লেখিত ৫ মাসের যোগফল যদি ১৫৬ দিনের বেশি বা কম হয়, একমাত্র সেক্ষেত্রে বিশ্বকর্মা পূজার তারিখ একদিন এগিয়ে বা পিছিয়ে পড়ে। অর্থাৎ ১৫৬ দিনের ১ দিন বেশি হলে তখন ১৭ সেপ্টেম্বরের সঙ্গে ১ যোগ হয়ে ১৮ সেপ্টেম্বর হবে। আবার ১৫৬ দিনের ১ দিন কম হলে তখন ১৭ সেপ্টেম্বরের সঙ্গে ১ বিয়োগ বা কম হয়ে ১৬ সেপ্টেম্বর হবে। তবে সেটি খুবই ব্যতিক্রমী ঘটনা। ২০১৯ সালে বিশ্বকর্মা পূজা উদ্‌যাপিত হয়েছিল ১৮ সেপ্টেম্বর। এই বছর মানে ২০২৩ সালেও বিশ্বকর্মা পূজা উদ্‌যাপিত হবে ১৮ সেপ্টেম্বর। এই বছরে ভাদ্র মাস-সহ আগের ৫ মাসের মোট যোগফল হয়েছে (বৈশাখ-৩১ + জ্যৈষ্ঠ- + ৩২ + আষাঢ়- ৩১ + শ্রাবণ- ৩২ + ভাদ্র- ৩১) = ১৫৭ দিন। তাই ১৭ সেপ্টেম্বরের জায়গায় এবছর বিশ্বকর্মা পূজার তারিখ ১৮ সেপ্টেম্বর। গত বছর ২০২২ সালে এর যোগফল হয়েছিল (বৈশাখ-৩১ + জ্যৈষ্ঠ-৩১ + আষাঢ়-৩২ + শ্রাবণ-৩১ + ভাদ্র-৩১) = ১৫৬ দিন।

বিশ্বকর্মার হাতে দাঁড়িপাল্লা কেন? দাঁড়িপাল্লার দুই দিকে দুইরকম জিনিস সমান সমান রেখে জীবনে ভারসাম্য বা স্থিরতা আনতে হয়। একটি হলো নিজের কাজ এবং অন্যটি হলো কাজের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান। দাঁড়িপাল্লায় যেমন দুই পাল্লার মধ্যে সমান সমান ওজন না থাকলে পাল্লাটির কাঁটা স্থির থাকে না বা ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়। তেমনি মানুষের জীবনেও জ্ঞান ও কর্ম দুটি জিনিসে সমানতা না থাকলে জীবনে সার্থকতা আসে না। অন্যদিকে কাজ কম করলে বা কাজের পাল্লা কম হলে এবং জ্ঞানের পাল্লা বেশি হলেও লাভ হবে না। কারণ ভারসাম্য থাকবে না। কর্ম না করলে বা কর্ম কম করলে সাংসারিক জীবনেও অশান্তি দেখা দেয়। শুধু জ্ঞানে তো আর পেট ভরে না। পেট ভরার জন্য কর্ম করা বা কাজ করা অবশ্যই দরকার।

হাতি বিশ্বকর্মার বাহন কেন? বিশ্বকর্মার বাহন হলো হাতি। বিশ্বকর্মা হলেন কর্মের দেবতা। আর হাতি হলে শক্তিমান। কথায় বলে হাতির মতো শক্তি। কাজ করতে গেলে শক্তি চাই। আর হাতির মতো শক্তি থাকলে তো আর কথাই নেই। হাতি শুঁড় দিয়ে নানা সহজ কাজ থেকে কঠিন কাজও সিদ্ধ করতে পারে। আবার মাহুত যখন হাতিকে দিয়ে কাজ করায়, তখন হাতি একদম শান্ত মনে কাজগুলি সম্পন্ন করে থাকে। অর্থাৎ কাজের সময় মাথা ঠাণ্ডামাথা থাকলেই কাজের মাধ্যমে শিল্পের সঠিক বিকাশ সম্ভব। বিশ্বকর্মা হলেন সূক্ষ্ম শিল্পকর্ম থেকে বৃহৎ প্রাসাদ নির্মাণ অর্থাৎ

সকল কর্মেরই দেবতা। তাই এখানে কাজের নিপুণতা যেমন দরকার, তেমনি চাই দৈহিক ক্ষমতা এবং মাথা ঠাণ্ডা রাখার ধৈর্য—যেমনটি হাতির মধ্যে দেখা যায়।

বিশ্বকর্মার জন্ম নিয়ে পুরাণে নানা আখ্যানের অবতারণা করা হয়। কোনো পুরাণ মতে তাঁর জন্ম অষ্টবসুর অন্যতম প্রভাসের ঔরসে এবং বৃহস্পতির ভগিনী বরবর্ণিনীর বা যোগসিদ্ধার গর্ভে। আবার ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ মতে, প্রজাপিতা ব্রহ্মার নাভিদেশ থেকে বিশ্বকর্মার সৃষ্টি বলে উল্লেখ আছে। বেদে বিশ্বকর্মাকে অজাতপুরুষ বা সনাতন পুরুষ রূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

বিশ্বকর্মা হলেন বিশ্বের কর্মা বা নির্মাণকর্তা। তাই তাঁকে বিশ্বকর্মা বলা হয়। তিনি হলেন দেবতাদের কর্মকার। তিনি স্বর্গের কারিগর নামেও পরিচিত। শিল্পী ও নির্মাতাদের দেবতা হলেন বিশ্বকর্মা। কথিত আছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নক্‌শা তৈরি করেছিলেন এই বিশ্বকর্মা। তাঁকে স্বর্গীয় সূত্রধরও বলা হয়ে থাকে।

বিশ্বকর্মা দেবশিল্পী নামেও পরিচিত। তিনি এমন একজন দেবতা যাঁকে বলা হয় বিশ্বের প্রথম ইঞ্জিনিয়ার বা প্রকৌশলী। দেবপুরীতে দেবতাদের সুদৃশ্য, সুবিশাল অট্টালিকা থেকে শুরু করে দেবতাদের গমনাগমনের জন্য দ্রুতগামী যানবাহন সকল প্রকার অলংকার ইত্যাদি নির্মাণে তিনি অসামান্য এবং অবর্ণনীয় কৃতিত্ব রেখেছেন। বিষ্ণুর সুদর্শন চক্র, শিবের ত্রিশূল, কুবেরের অস্ত্র, ইন্দ্রের বজ্র, কার্তিকের শক্তি-সহ দেবতাদের জন্য বিভিন্ন অকল্পনীয় অস্ত্রের স্রষ্টা স্বয়ং বিশ্বকর্মা। ভক্তরা বিশ্বাস করেন বিশ্বকর্মাই এই বিশ্বের সব কর্মের সম্পাদক।

বিভিন্ন বড়ো বড়ো যন্ত্রপাতি যেগুলো দিয়ে কোনো কিছু তৈরি করা যায় সেগুলিকেও বিশ্বকর্মা পুজোর দিন পূজা করা হয়। এছাড়া অনেক কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে থাকে, অনেকের প্রাণহানি ঘটে, সেই কারণে এই বিশ্বকর্মা পূজার দিন সেই জায়গাতে কোনোরকম দুর্ঘটনা যাতে না ঘটে, সেই প্রার্থনা করে বিশ্বকর্মা পূজা করা হয়। বিশ্বকর্মার পূজার দিনে কাজের জায়গা থেকে নেতিবাচক এবং অপশক্তির বিনাশ ঘটাতে বিশ্বকর্মার পূজা করা হয়ে থাকে।

বিশ্বকর্মার সন্তুষ্টি অর্জন ও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসেবে পূজার দিনে শুধু প্রার্থনাই করা হয় না, সেই সঙ্গে মেতে উঠেন আনন্দে, যাতে আবার পরের দিন থেকে নতুনভাবে কাজে যোগদান করতে পারেন। এর সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের ফল, মিষ্টি, খাবার-দাবার, খাওয়া-দাওয়া হয়েই থাকে।

কারখানা, শিল্পপ্রতিষ্ঠান, যন্ত্রপাতি আছে বা ইঞ্জিনিয়ারিং কাজকর্ম হয় এ সমস্ত স্থানেই বিশ্বকর্মা পুজোর দিন কোনো উৎপাদন করা অশুভ। তাই এদিন কারিগরেরা সমস্ত যন্ত্রপাতি বিশ্বকর্মার নামে সমর্পণ করে বা এগুলি ব্যবহারে বিরত থাকে। তাঁর বিভিন্ন গুণাবলী ও কর্মকাণ্ড মানবজাতির কাছে অত্যন্ত মনোরঞ্জক এবং অনুপ্রেরণারও বটে। শিল্পী হিসেবে একজন মানুষকে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা একজন অনুঘটকের কাজ করেন। বিশ্বকর্মার কৃপায় সকল মানব শিল্পগুণে পারদর্শিতা লাভ করে থাকেন বলে হিন্দুরা বিশ্বাস করেন। বিশ্বকর্মাকে অতুলনীয় ও অভাবনীয় শিল্পগুণ সম্পন্ন হিসেবে পুরাণে তাঁকে বিশেষ স্থান দেওয়া হয়েছে এবং তিনি একজন কঠোর নিষ্ঠাবান ও পরিশ্রমী শিল্পীরূপে দেবত্বে উত্তীর্ণ হয়েছেন।

বিশ্বযজ্ঞে তিনি নিজেকে আহুতি দিয়েছেন, তিনি বাচস্পতি অর্থাৎ বাক্যের অধীশ্বর। তিনি মনোজেব। মানে তিনি মনের মতো বেগমান। অর্থাৎ মন যেমন সবচেয়ে দ্রুতগতিতে চলে, তিনিও তেমনি মনের ন্যায় দ্রুতবেগে চলতে পারেন। তিনি বিশ্বের সকল প্রাণীর মঙ্গলকারী। তিনি সাধুকর্মা, অর্থাৎ তাঁর চেষ্টা ও বিধান মঙ্গলময়। তিনি বদান্য, কল্যাণকর্মা, বিধাতা।

তাঁর চক্ষু, মুখমণ্ডল, বাহু ও পা সর্বদিক বিদ্যমান। বাহু ও পায়ের সাহায্যে ইনি স্বর্গ ও মর্ত্য নির্মাণ করেন। ইনি সত্যযুগে স্বর্গ, ত্রেতা যুগে লঙ্কাপুরী তৈরি করেছিলেন। রামের জন্য সেতুবন্ধন বা রামসেতু নির্মাণকালে তিনি পুত্র নল-নীলকে পাঠিয়েছিলেন। দ্বাপর যুগে কৃষ্ণের পবিত্র নগরী দ্বারকা তিনিই নির্মাণ করেছিলেন। পুরীর বিখ্যাত জগন্নাথ মূর্তিটিও তিনিই নির্মাণ করেছিলেন। পাণ্ডবদের ইন্দ্রপ্রস্থ, ব্রহ্মার পুষ্পক রথ তিনিই নির্মাণ করেছিলেন।

বিশ্বকর্মার কিছু অমর সৃষ্টি : সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—এই চারযুগ ধরে ছড়িয়ে রয়েছে বিশ্বকর্মার অমর কীর্তি। সত্যযুগে বিশ্বকর্মা সৃষ্টি করেছিলেন স্বর্গলোক। সেই প্রাসাদ থেকেই দেবরাজ ইন্দ্র মর্ত্যলোক বা পৃথিবী শাসন করতেন। ত্রেতা যুগে বিশ্বকর্মা সৃষ্টি করেছিলেন সোনার লঙ্কা বা রাবণের লঙ্কাপুরী। দ্বাপর যুগে বিশ্বকর্মা সৃষ্টি করেছিলেন দ্বারকা, ও ইন্দ্রপ্রস্থ।

বিশ্বকর্মা যে শুধু কর্মে সুদক্ষ তা নয়, বরং তিনি বেশ কিছু গ্রন্থও লিখে রেখে গেছেন উত্তরসুরীদের জন্য। বিশ্বকর্মা রচিত স্থাপত্যশিল্প বিষয়িক গ্রন্থটির নাম 'বাস্তুশাস্ত্রম্'। 'বস্তু' শব্দ থেকে 'বাস্তু' শব্দটি এসেছে। বাস্তু শব্দের অর্থ পৃথিবী। আবার ব্যাপক অর্থে সমস্ত প্রাণীর বসবাসের স্থানই হলো বাস্তু। কাজেই বলা যায় যে বাস্তু মানে শুধু পরিকল্পিত মনুষ্যগৃহই নয়, দেবতা থেকে শুরু করে সমস্ত প্রাণীর বাসস্থানকেই বাস্তু বলা হয়। বাস্তুশাস্ত্রে বাস্তু শব্দের অর্থ ব্যাপক। এই শিল্পকে শুধু নির্মাণ শিল্প না বুঝিয়ে 'পরিকল্পনা', 'নির্মাণ', 'চিত্র', 'অলংকরণ,' 'স্বর্ণ, 'চর্ম' 'বয়নশিল্প' 'অস্ত্রশিল্প', 'পোতনির্মাণ', 'মূর্তি নির্মাণ', প্রভৃতি ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত। ১৯১৩ সালে মহামহোপাধ্যায় গণপতিশাস্ত্রী 'বাস্তুবিদ্যা' বা 'বাস্তুশাস্ত্রম্' গ্রন্থটি আবিষ্কার করে মুদ্রিত করেন। বিশ্বকর্মার নামে প্রচলিত বাস্তুশাস্ত্রটির নাম 'বিশ্বকর্মাবাস্তুশাস্ত্রম্'।

'বিশ্বকর্মাবাস্তুশাস্ত্রম' গ্রন্থে সুপরিকল্পিতভাবে গৃহ নির্মাণ, গ্রাম ও নগর পত্তনের নিয়মাবলী ও বিধিনিষেধ পাওয়া যায়। বিশ্বকর্মা রচিত এই গ্রন্থে 'গৃহ', 'মন্দির', 'গ্রাম', 'নগর', 'যন্ত্র' প্রভৃতির বর্ণনা দেখতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের প্রথমেই বলা হয়েছে জগতের কল্যাণ কামনায় এই শাস্ত্র প্রচার করছেন ('বাস্তুশাস্ত্রং প্রবক্ষ্যামি লোকানাং হিতকাম্যায়া')। ▯



বিশ্বকর্মাঃ শাস্ত্রে ও বাংলা সাহিত্যে

রবিব্রত ঘোষ

কিষ্কিন্ধ্যা, দ্বারকা, লঙ্কা। যদি বলা হয় এই তিনটি পৌরাণিক নগরের মধ্যে মিল কোথায়? অনেকেই হতভম্ব হবেন, অনেকেই বই ঘাঁটার চেষ্টা করবেন, অনেকেই পুরাণ পড়ার কথা ভাববেন। সঠিক উত্তর হলো প্রত্যেকটিই বিশ্বকর্মার তৈরি করা।

দেব-দেবীর মধ্যে বিশ্বকর্মা অত্যন্ত ব্যতিক্রমী এক দেবতা। অন্যদের মতো ক্রোধী নন, বদমেজাজি নন, কোনো রাক্ষস বা অসুরকে বধ করেন নি। তিনি একটার পর একটা সৃষ্টি করে গেছেন। ঋক্‌বেদে বিশ্বকর্মাকে সৃষ্টিশক্তির দেবতা বলা হয়েছে। ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির প্রাক্ অবস্থা থেকে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা বলেও তাকে উল্লেখ করা হয়েছে।

বিশ্বকর্মা মূলত বৈদিক দেবতা, অবশ্য কোনও কোনও তাত্ত্বিক এটাও মনে করেন যে বিশ্বকর্মা মূলত প্রাক্ আর্য যুগের দেবতা। বেদের বিভিন্ন অংশে বিশ্বকর্মার উল্লেখ পাওয়া যায় সেখানে তাঁকে বিশ্ব সৃষ্টিকর্তা হিসেবেই উল্লেখ করা হয়েছে। ঋক্‌বেদের দশম মণ্ডলের ৮১ ও ৮২তম সূক্তে বলা হয়েছে— কিং স্বিদাসীদধিষ্ঠানমারম্ভণং/ কতমৎস্বিৎকথাসীৎ।/যতো ভূমিং জনয়ন্বিশ্বকর্মা বিদ্যামৌর্ণোন্মহিনা বিশ্বচক্ষাঃ।। বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো।' অর্থাৎ সৃষ্টিকালে অধিষ্ঠান কী ছিল? কোন স্থান হতে কীভাবে তিনি সৃষ্টির কাজ আরম্ভ করলেন? সেই বিশ্বকর্মা, বিশ্বদর্শনকারী দেব কোন স্থান থেকে পৃথিবী নির্মাণপূর্বক প্রকাণ্ড আকাশকে উপরে বিস্তারিত করে দিলেন।

শুক্ল যজুর্বেদ সংহিতায় বলা হয়েছে— (১৩.৫৫)

অয়ং দক্ষিণা বিশ্বকর্মা। সত্য মনো বৈশ্বকর্মণং।

অর্থাৎ সকলের স্রষ্টা বিশ্বকর্মা। বায়ু দক্ষিণ দিক থেকে প্রবাহিত হচ্ছে, সেরূপে তোমাকে গ্রহণ করছি। বিশ্বকর্মার অপত্য মনরূপে।

কৃষ্ণ যজুর্বেদ সংহিতায় বলা হয়েছে— (৪.৪.৬)

বিশ্বকর্মা জ্যোতিষ্ময়, তোমাকে সকল প্রাণীর প্রাণ ও অপানবত্তি লাভের জন্য অন্তরিক্ষের উপরে স্থাপন করুন। অথর্ববেদ সংহিতায় ঋষিরা (২০.৫.২৫.৬) ইন্দ্ররূপ পরমেশ্বরকেই 'বিশ্বকর্মা' এবং 'বিশ্বদেবো' নামে অবিহিত করেছেন।

ত্বমিন্দ্রাভিভূরসি ত্বং সূর্যমরোচয়ঃ।
বিশ্বকর্মা বিশ্বদেবো মহাঁ অসি।।

অর্থাৎ বিশ্বকর্মাই ইন্দ্র হয়ে অসুর বিনাশ করেন, আবার তিনিই প্রজাপতি হয়ে জগৎ সৃষ্টি করেন।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ : (৪.১৭) এ বলা হয়েছে :

এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা। সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ। হৃদা মনীষা মনসাহভিক্লৃপ্তো য এতদ্ বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।।

অর্থাৎ পরমাত্মা এই জগৎরূপে নিজেকে প্রকাশিত করেছেন, তাই বিশ্বের স্রষ্টা বিশ্বকর্মা। তিনিই সেই মহান পুরুষ, তিনিই প্রত্যেক জীবের অন্তরে প্রবিষ্ট হয়ে

আছেন। যাঁরা এই পরমাত্মাকে জানেন তাঁরা মৃত্যুকে অতিক্রম করেন। অর্থাৎ তাঁদের আর মৃত্যুভয় থাকে না। এই উপনিষদেরই আরেকটি জায়গায় বিশ্বকর্মাকে হৃদয়ের অধিপতি বলা হয়েছে।

রামায়ণের একাধিক জায়গায় বিশ্বকর্মার উল্লেখ পাওয়া যায়। আদিকাণ্ডে বলা হয়েছে, বিশ্বকর্মা দুটি ধনুক নির্মাণ করেন, তার মধ্যে একটি শিবকে দেন আরেকটি পরশুরামকে দেন। শ্রীরাম শিবের হরধনু ভঙ্গ করে সীতাকে বিয়ে করেন। আর একটি যেটি পরশুরামের কাছে ছিল তাতে জ্যা সংযোগ করা মাত্রই ধনুটি ভেঙে যায় ও পরশুরামের দর্প চূর্ণ হয়। রামায়ণ অনুসারে ঋষি অগস্ত্যর ভবন, কৈলাস পর্বতে কুবেরের অলকাপুরী, ব্রহ্মার পুষ্পক রথ নির্মাণ করেন বিশ্বকর্মা।

এছাড়াও সোনার লঙ্কা বিশ্বকর্মা নির্মাণ করেন। পুরাণ অনুসারে পার্বতীর সঙ্গে বিয়ের পর শিব একটি প্রাসাদ নির্মাণের দায়িত্ব দেন বিশ্বকর্মাকে। বিশ্বকর্মা সোনা দিয়ে এই অসাধারণ প্রাসাদ নির্মাণ করেন। শিবভক্ত রাবণ শিবের কাছ থেকে এই প্রাসাদ চেয়ে নেন। অবশ্য অন্যমতে, কুবেরের জন্য এই প্রাসাদ নির্মাণ করেন বিশ্বকর্মা, যা পরে কুবেরের সৎ ভাই রাবণ, কুবেরকে যুদ্ধ পরাজিত করে কেড়ে নেন। বিষ্ণুর সুদর্শন চক্র বিশ্বকর্মা তৈরি করেন। শিবের ত্রিশূল, কুবেরের অস্ত্র, ইন্দ্রের বজ্র বিশ্বকর্মা তৈরি করেন। মহাভারত অনুসারে কৌরবদের রাজধানী হস্তিনাপুর তৈরি করেন বিশ্বকর্মা। এমনকী পাণ্ডবদের জন্য ময় দানবের তৈরি করা ইন্দ্রপ্রস্থের শিল্পসুষমাও বিশ্বকর্মার দেওয়া।

কৃষ্ণের দ্বারকা তৈরি করতেও বিশ্বকর্মার অবদান আছে। দ্বারকা নির্মাণের জন্য কৃষ্ণ বিশ্বকর্মার সহায়তা নেন। পুরো শহরটি ৬টি ভাগে ভাগ করা আবাসিক ও প্রশাসনিক এলাকা, চওড়া রাস্তা, বিশাল প্রাসাদ, উদ্যান, সরোবর ইত্যাদির সমন্বয়ে তৈরি একেবারে আধুনিক শহর। যার আর্কিটেক্ট বিশ্বকর্মা। চণ্ডী অনুসারে মহিসাযুর বধের সময় দেবীকে বিশ্বকর্মা নিজের হাতে তৈরি অভেদ্য কবচ উপহার দেন। পুরাণ অনুসারে সুন্দ ও উপসুন্দ নামে দুই অসুরের হাত থেকে দেবালয় বাঁচাতে ব্রহ্মাণ্ডের সব বস্তুর মধ্যে থেকে শক্তি নিয়ে তিলোত্তমা গড়ে তোলেন।

পুরীর জগন্নাথ দেবের মূর্তিও তৈরি করেন বিশ্বকর্মা। পুরাণে বিশ্বকর্মাকে, কর্তা শিল্প সহস্যনাম; অর্থাৎ সহস্য শিল্পের অধিকর্তা বলে ভূষিত করা হয়েছে। বিশ্বকর্মা নিজেই ছিলেন চৌষট্টি কলা, ও স্থাপত্য বেদের প্রকাশক। পুরাণ মতে অষ্টবসুর অন্যতম প্রভাস ও বৃহস্পতির বোন বরস্ত্রীর পুত্র বিশ্বকর্মা। অবশ্য ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ অনুসারে ব্রহ্মার নাভিদেশ থেকে বিশ্বকর্মার উৎপত্তি। এই পুরাণের আর একটি জায়গায় বলা আছে অপ্সরা ঘৃতাচীর অভিশাপে মর্ত্যে বিশ্বকর্মার জন্ম হয়।

সূর্যের সঙ্গে বিশ্বকর্মার কন্যা সংজ্ঞার বিবাহ হয়। কিন্তু সংজ্ঞা সূর্যের তেজ সহ্য করতে পারছিল না। তাই পিতা বিশ্বকর্মা সূর্যের তেজকে আট ভাগ করে এক ভাগ দিলেন সূর্যকে দিলেন। আর বাকি আট ভাগে বানালেন বিষ্ণুর চক্র, শিবের ত্রিশূল, কার্তিকের অস্ত্র। আবার বৃত্রাসুর বধের জন্য দধিচী মুনির হাড় দিয়ে বানান শোভনকর্মা ও সুপ্রেরণীয় নামে দুটি বজ্র।

বিশ্বকর্মাকে নিয়ে চমকপ্রদ তথ্য হলো, পুরাণ অনুসারে স্থাপত্য বিদ্যার উপর বিশ্বকর্মা একটি বই লেখেন, যার নাম বাস্তুশাস্ত্রম্। ১৯১৩ সালে বিশিষ্ট সৎস্কৃত পণ্ডিত গণপতি শাস্ত্রী এই গ্রন্থটি খুঁজে পান। মধ্যযুগ থেকেই বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন অঙ্গনে বিশ্বকর্মাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন গাথা রচিত হয়েছে। বাংলা মঙ্গলকাব্যের চণ্ডীমঙ্গলে দেউল নির্মাণ, নৌকা গঠনের কারিগর হলেন বিশ্বকর্মা। শূন্য পুরাণে জন্মস্থান নির্মাণ, সোনার কাস্তে নির্মাণের কর্মী। অন্নদামঙ্গলে শিবের সিদ্ধির কুড়া, অন্নপূর্ণার রত্নহার, পানপাত্র, বিশ্বেশ্বরের দেউল অন্নপূর্ণার মন্দির এবং জগন্নাথ পুরীর নির্মাতা। রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের ভাষায়, তুমি বিশ্ব গড়ো— তাই বিশ্বকর্মা নাম।

মনসামঙ্গলে বিশ্বকর্মাকে বেহুলার লোহার বাসরঘর তৈরি করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন চাঁদ সদাগর। আবার সেখানে ছিদ্র রেখে দেন দেবী মনসার আদেশে। আবার বেহুলার স্বর্গের উদ্দেশে যাত্রার ভেলাও বিশ্বকর্মা তৈরি করেন। কেতকা দাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল কাব্যে পাওয়া যায়, 'নানা অস্ত্রে সঙ্গে লৌহ কাটে লৌড় চাচে/লোহার বাসর ঘর গড়ে।' বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস গ্রন্থের রচয়িতা আশুতোষ ভট্টাচার্যের অসাধারণ পর্যবেক্ষণ— বিশ্বকর্মা, মঠ মন্দির নির্মাণের কাজের সঙ্গে দেবীদের কাঁচুলি নির্মাণের দায়িত্ব পর্যন্ত নিয়েছিলেন।

মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যে দ্বারকা নির্মাণ অংশে বিশ্বকর্মার কাজের বিস্তৃত একটি বিবরণ আছে। বাংলা সাহিত্যের প্রাক আধুনিক যুগের কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত একটি কবিতায় লিখছেন— বিশ্বকর্মা, বিশ্বকর্মা কীর্তিকর কারু/যে চতুর চেতনের চতুরালী চারু।।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর শুভদৃষ্টি গল্পের মুক ও বধির মেয়েটির সৌন্দর্য প্রসঙ্গে লিখেছেন— 'মেয়েটির সৌন্দর্য নিরতিশয়। যেন বিশ্বকর্মা তাকে সদ্য নির্মাণ করে ছেড়ে দিয়েছেন।' রানুকে লেখা আরেকটি চিঠির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'বিশ্বকর্মার কাজে আমরা যখন যে পরিমাণে তার সঙ্গে মিল রেখে, ছন্দ রেখে চলি সেই পরিমাণ কাজ আমাদের অক্ষয় কীর্তি হয়ে ওঠে।' বিখ্যাত ভ্রমণকাহিনী জাভা-যাত্রীর পত্রতে বিশ্বকর্মাকে উল্লেখ করছেন এই ভাবে— 'এই জায়গাটাতে বিশ্বকর্মার মানিব্যাগ ছিঁড়ে অনেকগুলি দ্বীপ সমুদ্রের মধ্যে ছিটকে পড়েছে।'

তবে এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের রসিকতার সর্বোত্তম উদাহরণ হতে পারে বিদ্যাসাগরকে নিয়ে। যখন তিনি বলছেন, 'বিশ্বকর্মা যেখানে চার কোটি বাঙ্গালি নির্মাণ করিতেছিলেন সেখানে হঠাৎ দু-একজন মানুষ গড়িয়া বসেন কেন তাহা বলা কঠিন!' □

প্রাচীন ভারতীয় গণিতশাস্ত্র একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা

আধুনিক বিজ্ঞানচর্চার পাশাপাশি, প্রাচীন ভারতীয় গণিত ও বিজ্ঞানের গবেষণা হলে ভারতের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধিত হতে পারে।

শাশ্বত বসু

"The Indian way of life provides the vision of natural, real way of life. We veil ourselves with unnatural masks. On the face of India are the tender expressions which carry the mark of creator's hand." অর্থাৎ ভারতীয় জীবনধারা প্রাকৃতিক, তা বাস্তব জীবনের পথ পপ্রদর্শন করে। আমরা অপ্রাকৃতিক মুখোশে নিজেদের আবৃত রাখি। আর ভারতের মুখে কোমল অভিব্যক্তি যা সৃষ্টিকর্তার হাতের চিহ্ন বহন করে। জর্জ বার্নার্ড শ'-এর এই মন্তব্যের যথার্থতা অনুভূত হয় যখন দেখি ভারতীয় বিদ্যা বাস্তব জীবনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়, পরা ও অপরা বিদ্যার মেলবন্ধনে ভারতীয় জীবনচর্যা যথার্থ শান্তিলাভের সহায়ক হয়ে ওঠে। কিন্তু বর্তমান ভারতবর্ষও যখন সেই 'unnatural masks' বা 'কৃত্রিম মুখোশ'-এ নিজেকে ঢাকতে চায়, বিদ্যা বলতে শুধুই স্থূল জড় বিষয়কে বোঝে, জীবন বলতে শুধুমাত্র জাগতিক সুখকে বোঝে তখন সেই প্রাচীন গৌরবময় ভারতবর্ষের সঙ্গে, যথার্থ ভারতীয় জীবনের সঙ্গে তার এক বিরাট পার্থক্য সূচিত হয়ে যায়। উপনিষদের একটি ঘটনার মধ্য দিয়ে একটু ফিরে দেখা যাক সেই 'real way of life' -এর দিকে।

ছান্দোগ্য উপনিষদে আমরা দেখি, শ্রীশ্রী নারদ ঋষি তাঁর আচার্য (গুরুদেব) শ্রীশ্রী সনৎ কুমারকে বললেন, "ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, ইতিহাস, পুরাণ, ব্যাকরণ, শ্রাদ্ধতত্ত্ব, গণিতশাস্ত্র, দৈবশাস্ত্র, কালতত্ত্ব, নীতিশাস্ত্র, দেববিদ্যা, ভূতবিদ্যা, ধনুর্বেদ, নক্ষত্রবিদ্যা (জ্যোতির্বিদ্যা), সর্প ও দেবজন বিদ্যা আমি এই সমস্ত বিদ্যাই জানি।" সুপ্রাচীন কাল থেকেই যে ভারতবর্ষে বিভিন্ন জাগতিক বা অপরাবিদ্যার মধ্যে গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যাও সম্যক রূপে অধীত হতো, ঋষি বাক্যটি তার সাক্ষর বহন করছে। কিন্তু এসমস্ত বিদ্যা জেনেও তিনি আত্মবিৎ হতে পারেননি, পরম সত্যকে লাভ করতে পারেননি। তাই সনৎকুমার তাঁকে জ্ঞানচর্চার সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর প্রদেশে নিয়ে চললেন। অপরা থেকে পরাবিদ্যার পথে। বাক্য থেকে বাক, বাক থেকে মন, মন থেকে সংকল্প, সংকল্প থেকে চিত্ত, চিত্ত থেকে ধ্যান, ধ্যান থেকে বিজ্ঞানে উত্তীর্ণ করলেন। এখানেও শেষ নয়। অবশেষে শ্রী সনৎকুমার বললেন, "নাল্পে সুখমস্তি। ভূমৈব সুখং ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য" (ছান্দোগ্য উপনিষদ, ৭/২৩/১) অর্থাৎ অল্পে সুখ নাই, ভূমাতেই (আত্মাতেই) সুখ। এই ভূমাকেই বিশেষ রূপে জানতে ইচ্ছা করবে।" অর্থাৎ প্রথমে অপরাবিদ্যা বা জাগতিক বিষয়গুলির তত্ত্ব জানতে হবে, তারপর অধ্যাত্মবিদ্যা বা পরাবিদ্যার চর্চা সম্ভব হবে। তাই বেদান্ত শুরু হয় 'অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা' এই শ্লোক দিয়ে। এর অর্থ 'ইহার পর আসে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা', কার পর? জাগতিক জ্ঞান বা বিদ্যা লাভ করে তার অসারতা (অখণ্ড শান্তি লাভে অক্ষমতা) জানার পর। এই বিষয়ে আলোচনা আর দীর্ঘায়িত না করে আমরা এই প্রবন্ধে বরং ভারতীয় 'রাশিং' বা গণিতের সম্পর্কে সাধ্যমত সামান্য আলোচনার চেষ্টা করব।

অনেকে ভারতীয় গণিত বলতে শুধুমাত্রা শূন্য ও দশমিকের আবিষ্কারকে বোঝেন। কিন্তু ভারতীয় গণিত উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করেছিল, যার ফলে বহু আলোকবর্ষ দূরের নক্ষত্রদের সম্পর্কেও ভারতবর্ষ সুস্পষ্ট ধারণা দিতে পেরেছিল। বেদের ষটঅঙ্গের (শিক্ষা, ব্যাকরণ, ছন্দ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ ও কল্প) মধ্যে জ্যোতির্বিজ্ঞান একটি। গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যাকে মহামুনি লগধ 'বেদাঙ্গ জ্যোতিষ' গ্রন্থটিতে এভাবে বলেছেন—

"যথা শিখা ময়ূরাণাং নাগানাং মণয়ো যথা।
তদ্বদ্বেদাঙ্গং শাস্ত্রাণাং গণিতং (জ্যোতিষং) মূর্ধনি স্থিতম"

(ঋগ্বেদীয় বেঃ জ্যোঃ ৩৫, যজুর্বেদীয় বেঃ জ্যোঃ ৪)

অর্থাৎ, যেমন ময়ূরের মাথায় শিখা, নাগের মাথায় মণি, তেমনি বেদাঙ্গ শাস্ত্রের সর্বোচ্চ শিখরে গণিত ও জ্যোতিষ অবস্থিত। এখানে 'জ্যোতিষ' শব্দ দ্বারা জ্যোতির্বিজ্ঞানকেই বোঝান হয়। হস্তরেখা বিচার জাতীয় বর্তমানে আমরা যে জ্যোতিষ শব্দটি ব্যবহার করে থাকি, সেটি জ্যোতির্বিজ্ঞানের ফলিত বিভাগ বা 'applied part'। বেদাঙ্গ, জ্যোতিষ এবং অন্যান্য জ্যোতিষ শাস্ত্রের গ্রন্থ তার প্রমাণ দেয়। আমরা এখানে যদিও জ্যোতিষ সম্পর্কে আলোচনা করছি না, তবুও তার উল্লেখ প্রয়োজন মনে হলো, কারণ উন্নত জ্যোতির্বিজ্ঞান উন্নত গণিত জ্ঞানের সাক্ষ্য বহন করে।

গণিত ভারতবর্ষের অতি প্রাচীন বিদ্যা। বেদের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে একঃ (১), দ্বি (২), ত্রি (৩) ইত্যাদি সব এক থেকে নয় সব সংখ্যার উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদ ২য় মণ্ডলের ১৮ নং সূক্তের ৫ ও ৬ নং শ্লোকে 'বিংশত্যা' (২০), 'ত্রিংশতা' (৩০), 'চত্বারিংশতা' (৪০) প্রভৃতি দশের গুণিতক সংখ্যা ১০০ পর্যন্ত সবকটি সংখ্যার উল্লেখ আছে। মধ্যবর্তী সংখ্যা সমূহের উল্লেখও পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ 'ত্রীণি শতা ত্রী সহস্রাণি অগ্নিম্ ত্রিংশ চ দেবা নব চাসপর্যন্' (ঋগ্বেদ ৩/৯/৯)। এই শ্লোকাংশে তিন হাজার তিন শত উনচল্লিশ (৩৩৩৯) সংখ্যাটির কথা বলা হয়েছে। এইরকম নানান সংখ্যার উল্লেখ ঋগ্বেদের অনেক স্থানে রয়েছে। শুক্ল যজুর্বেদে একটি শ্লোক পাওয়া যায়— "ইমা মে অগ্ন ইষ্টকা ধেনবঃ সন্ত্বেকা চ দশ চ শতং চ শতং চ সহস্রং চ সহস্রং চাযুতং চাযুতং চ নিযুতং চ নিযুতং চ প্রযুতং চার্বুদং চ ন্ যর্বুদং সমুদ্রাশ্চ মধ্যযং চান্তশ্চ পরার্ধশ্চৈতা মে অগ্ন ইষ্টকা ধেনবঃ সন্ত্বমুত্রামুষ্মিল্লোকে।" (১৭/২) এখানে দশ, শত, সহস্র, অযুত, নিযুত, প্রযুত, অর্বুদ, ন্যর্বুদ, সমুদ্র মধ্য, অন্ত, পরার্ধ এইরকম ১০ এর ১২ ঘাত পর্যন্ত সংখ্যার উল্লেখ রয়েছে। শুক্ল যজুর্বেদের ১৮ তম অধ্যায়ের ২৪

ও ২৫ শ্লোকে পাওয়া যায় ১, ৩, ৫, ৭, ৯ ... ৩৩ পর্যন্ত একটি অযুগ্ম (odd) সংখ্যার সারি (series) এবং ৪, ৮, ১২, ... ৪৮ পর্যন্ত একটি ৪-এর গুণিতক সংখ্যার সারি (series)। অর্ধ ১/২), পাদ (১/৪), কলা (১/১৬) প্রভৃতি ভগ্নাংশের উল্লেখ পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৯০ সূক্তের ৩ ও ৪ নং শ্লোকে রয়েছে ১/৪ ('পাদো অস্য'), ৩/৪ ('ত্রিপাদ') প্রভৃতি ভগ্নাংশ সংখ্যার উল্লেখ এবং সেখানে স্পষ্টই বলা হয়েছে, এক ভাগ থেকে ১/৪ অংশ বাদ দিলে ৩/৪ অংশ থাকে। অর্থাৎ, ভগ্নাংশের যোগ ও বিয়োগের ধারণাটি সুস্পষ্ট। এছাড়া তৈত্তিরীয় সংহিতা, শতপথ ব্রাহ্মণ প্রভৃতির মধ্যে গুণ ও ভাগের ধারণা পাওয়া যায়। বেদের বিভিন্ন স্থানে 'অক্ষ্ণয়' শব্দটি পাওয়া যায় যার অর্থ হলো কোনো সমকোণী ত্রিভুজের অতিভূজ অথবা কোনো বর্গক্ষেত্র, আয়তক্ষেত্র প্রভৃতির কর্ণ (তির্যক বিন্দুর সংযোজকারী রেখা)। বেদে যে সমস্ত যজ্ঞের আয়োজনের কথা বলা হয়েছে, সেখানে বিভিন্ন জ্যামিতিক আকারের যূপ প্রভৃতি নির্মাণের কথা আছে। শুধুমাত্র ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, বহুভুজের জ্ঞানই নয়, সেই সমস্ত আকার ও আয়তনের যূপ নির্মাণের পদ্ধতিও যে তৎকালীন মানুষের জ্ঞাত ছিল তার প্রমাণ বেদে ও ব্রাহ্মণে পাওয়া যাচ্ছে, যা প্রমাণ করে তাঁরা গণিতের তত্ত্বগুলি অবগত ছিলেন। বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইন প্রাচীন ভারতীয় মনীষাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেছিলেন, ''We owe a lot go the Indians, who taught us how to count, without which no worthwhile scientific discovery could have been made.'' অর্থাৎ আমরা ভারতীয়দের কাছে অনেক কৃতজ্ঞ, যারা আমাদের শিখিয়েছে কীভাবে গণনা করতে হয়, যা ছাড়া কোনো সার্থক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করা যেত না।

বৈদিক সূত্রাবলী বিশেষত শুল্ব সূত্র, শ্রৌত সূত্র ইত্যাদি গণিতের বিভিন্ন শাখার উপর আলোচিত। যদিও বহু প্রাচীন হওয়াতে সেই সমস্ত তথ্যাবলী আজ বিলুপ্ত প্রায়, তবুও যতটুকু অবশিষ্ট আছে, সেখান থেকে গবেষকগণ অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করেছেন। এমন সব শ্লোক উদ্ধার করা গেছে যা দেখে বিজ্ঞানীগণ চমৎকৃত হয়েছেন। আমেরিকান গণিতজ্ঞ অ্যালবার্ট বার্ক বিশ্ব গণিতের ওপর চর্চা করে বলেছেন, ভারতবর্ষেই প্রথম জ্যামিতির আবিষ্কার হয়েছিল এবং প্রাচীন ভারতীয় ঋষি বৌধায়ন প্রায় খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ অব্দে কয়েকটি সূত্র প্রণয়ন করেন যেটির মধ্যে একটি বর্তমানে পিথাগোরাস আবিষ্কৃত 'পিথাগোরাসের উপপাদ্য' নামে খ্যাত। খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ অব্দে আবিষ্কৃত ফিথাগোরাসের উপপাদ্যটি হলো—''কোনো সমকোণী ত্রিভুজের দীর্ঘতম বাহুর বর্গ, অপর দুই বাহুর বর্গের যোগফলের সমান হয়।'' বৌধায়ন সূত্রের বিবৃত হলো--- ''দীর্ঘচতুরশ্র্যাক্ষ্ণয়া রজ্জুঃ পার্শ্বমানী তির্যগ্‌মানী, চ যৎ পৃথগ্ ভূতে কুরুতস্তদুভয়ং করোতি।'' অর্থাৎ দীর্ঘতম রজ্জু (দড়ি) যে ক্ষেত্রফল উৎপন্ন করে, সংলগ্ন পার্শ্ববর্তী রজ্জুগুলি যে ক্ষেত্রফল উৎপন্ন করে তাদের সমষ্টির সমান।

এই বৈদিক সময়েরও ন্যূনতম ২৫০০ বছর পর যে সমস্ত ভারতীয় গণিতজ্ঞ তথা জ্যোতির্বিজ্ঞানী জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাঁরাও এই চর্চাকে ধরে রাখার চেষ্টা করেন। এঁদের মধ্যে আর্যভট্ট, ভাস্করাচার্য, ব্রহ্মগুপ্ত, বরাহমিহির, মহাবীরাচার্য, গণেশ দৈবজ্ঞ প্রমুখ অনেকের নাম ও তাঁদের রচিত গ্রন্থাদি পাওয়া যায়। আর্যভট্ট রচিত 'গণিত পাদ-এ গণিতের বিষয়ে, 'কালক্রিয়া পদ'-এ সময়ের বিষয়ে এবং 'গোল পাদ'-এ জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

''প্রণিপত্যৈকমনেকং কং সত্যাং দেবতাং পরং ব্রহ্ম।

আর্যভটস্ত্রীণি গদতি গণিতং কালক্রিয়াং গোলং।।''

তিনি তাঁর পূর্বজ ভারতীয় ঋষিদের গণনার সঙ্গে একমত হয়ে কল্প, যুগ, মনু প্রভৃতি বৃহৎ সময়ের পরিমাপকে সম্মতি জানিয়েছেন। শুধু তাই নয়, বেদের মধ্যে আমরা যে দশ, শত, সহস্র, অযুত প্রভৃতি দশের ঘাত (power)-এর পরিচয় পেয়েছিলাংম, আর্যভট্টের গ্রন্থেও সেগুলি পাওয়া যায়—

''একং দশ চ শতশ্চ সহস্রমযুতনিযুতে তথা প্রযুতং।

কো অর্বুদং বৃন্দং স্থানাৎ স্থানং দশগুণং স্যাৎ।।'' (গণিতপাদ–২)

অর্থাৎ, একক, দশক, শতক, সহস্র, অযুত, নিযুত, প্রযুত, অর্বুদ প্রভৃতি যথাক্রমে দশের গুণিতক স্থান অধিকার করে। পরবর্তী শ্লোকে (গণিত পাদ ৩) তিনি বর্গ (square), ঘন (cube)-এর ধারণা দিয়েছেন। পরবর্তী শ্লোকগুলিতে বর্গমূল, ঘনমূল, তলের ক্ষেত্রফল, ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, গোলক, ষড়ভুজ প্রভৃতি ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্র দিয়েছেন। উদাহরণ স্বরূপ ---'ত্রিভুজস্য ফলশরীরং সমদলকোটিভুজার্ধসংবর্গঃ' (গণিতপাদ ৬) অর্থাৎ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল =১/২) X ভূমি X উচ্চতা। দশম শ্লোকে আছে—

''চতুরধিকং শতমষ্টগুণং দ্বাষষ্টিস্তথা সহস্রাণাং।

অযুতদ্বয়বিষ্কম্ভস্য আসন্নাং বৃত্তপরিণাহঃ।।''

অর্থাৎ ১০৪ কে ৮ দিয়ে গুণ করে ৬২০০০ যোগ করলে যা ফল হয়, তা ২০০০০ ব্যাস বিশিষ্ট বৃত্তের পরিসীমা হয়। এখন ১০৪ X ৮ = ৮৩২,৮৩২ + ৬২০০০ = ৬২৮৩২; তাহলে বৃত্তের পরিসীমা/ব্যাস = ৬২৮৩২/২০০০০ = ৩.১৪১৬। এই হলো পাই (π) এর মান, আর্যভট্ট গণনা অনুযায়ী। চার দশমিক স্থান পর্যন্ত এই মান নির্ভুল হলেও আর্যভট্ট একে 'আসন্ন' বা 'প্রায় নিকটবর্তী' মান বলেছেন। জগৎ আর্যভট্টকেই প্রথম 'পাই (π)'-এর আবিষ্কর্তা বলে স্বীকার করেছে।

জ্যামিতিক সূত্রাবলী ও উপপাদ্যগুলি ছাড়াও ত্রিকোণমিতি (trigonometry), সমীকরণ এবং তার সমাধান (equation and solution), সমান্তর ও গুণোত্তর প্রগতি (AP and GP) প্রভৃতি বিষয়ে আর্যভট্টের অনেক কাজ তাঁর গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে।

পরবর্তীকালে ভাস্করাচার্য রচিত 'মহাভাস্করীয়ম', 'লঘু ভাস্করীয়ম্' এবং 'আর্যভট্ট ভাষ্য' প্রভৃতি গণিতের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। 'আর্যভট্ট ভাষ্য' রচনা থেকে বোঝা যায়, সেই সময় পূর্বসূরীদের কাজের ওপর গবেষণা হতো। জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি ও সমীকরণের ওপর ভাস্করাচার্য্যের অনেক কাজ তাঁর গ্রন্থে পাওয়া যায়। ব্রহ্মগুপ্ত অনেক ক্ষেত্রে আর্যভট্টের মতের বিরোধিতা করেছেন। এথেকেও গবেষণা ও চর্চার বিষয়টি প্রমাণিত হয়। ব্রহ্মগুপ্তের ব্রহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত, খণ্ডখাদক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। জ্যামিতি, সমীকরণ, Numerical Analysis প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর অনেক কাজ রয়েছে। ব্রহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত গ্রন্থে তিনি বৃত্তীয় চতুর্ভুজের (Cyclic Quadrilateral) ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্র আবিষ্কার করেছেন— যদি a, b, c, d চতুর্ভুজের চারটি বাহু হয়, পরিসীমা যদি হয় a+b+c+d = 2s, তাহলে তার ক্ষেত্রফল হবে (s-a) (s-b) (s-c) (s-d) এর বর্গমূলের সমান।

'ভুজযোগার্ধচতুষ্টয় ভুজোনঘাতাৎ পদং সূক্ষ্ম ' (১২/২১)। এই আবিষ্কারের ১০০০ বছর পরে W. Snell এই সূত্রটি দিয়েছিলেন।

বরাহমিহিরের পঞ্চ সিদ্ধান্তিকা, বৃহৎ সংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বরাহমিহির গণিতশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিদ্যার বিষয়ে প্রাচীন ভারতীয় ঋষি যেমন—গর্গ, পরাশর, কশ্যপ, দেবল প্রমুখের কাছে ঋণ স্বীকার করেছেন। এথেকে প্রমাণিত হয়েছে, ভারতবর্ষে আর্যভট্টের আবির্ভাবের বহু পূর্বেই গণিত ও জ্যোতিষ চর্চা



উৎকর্ষতার সঙ্গেই সাধিত হয়েছে। যেখানে বরাহ মিহিরের মতো গণিত পণ্ডিত এ কথা স্বীকার করে নিচ্ছেন, সেখানে এই নিয়ে যদি কেউ মনে করেন যে প্রাচীন ভারতীয় ঋষিরা তাত্ত্বিক গণিত না জেনেই তার ব্যবহার করতেন, তাহলে তা ঠিক ধারণা বলে মনে হয় না।

মহাবীরাচার্য রচিত 'গণিত সার সংগ্রহ' একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থ। জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি, সমীকরণ, বিন্যাস-সমবায় (permutation-combination), calculus প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। প্রায়ই দেখা গেছে, ভারতীয় গণিতজ্ঞরা বাস্তব কিছু সমস্যার (Real life mathematical problems) মাধ্যমে নিজেদের তত্ত্বকে প্রকাশ করেছেন। মহাবীরাচার্য কৃত কাজগুলিতেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। এ প্রসঙ্গে একটি উদাহরণ দেখা নেওয়া যাক—

''গজযূথস্য ত্র্যংশঃ শেষপদং চ ত্রিসংগুণং সানৌ।

সরসি ত্রিহস্তিনীভির্নাগো দৃষ্টঃ কতীহ গজাঃ।।''

অর্থাৎ, একটি হাতির দলের ১/৩ অংশের মাথা দেখা যাচ্ছে এবং বাকি অংশের বর্গমূলের তিন গুণকে পাহাড়ের ধারে দেখা গেল। একটি হ্রদে একটি পুরুষ হাতি ও তিনটি স্ত্রী হাতি দেখা গেল। কতগুলি হাতি ছিল? এটি একটি দ্বিঘাত সমীকরণের প্রয়োগ। দ্বিঘাত সমীকরণটি হলো ঃ $x/3 + 3\sqrt{(2x/3)} + 4 = x$ যেখানে x = মোট হাতি। ভারতীয় গণিতজ্ঞদের গবেষণা, কাজ ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা এই প্রবন্ধে সম্ভব নয়। তবে ভারতীয় জীবনে গণিতের প্রভাব বিষয়ে মহাবীরাচার্যের একটি উক্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য—

''লৌকিক বৈদিক সামায়িকো অপি যঃ।

ব্যাপারস্তত্র সর্বত্র সংখ্যানমুপযুজ্যতে।।''
(গণিত সার সংগ্রহ ১/৯)

অর্থাৎ, ''জাগতিক, বৈদিক অথবা ধর্মীয় ক্ষেত্রে গণিত ব্যবহৃত হয়।'' বোঝা গেল, অতি প্রাচীন কাল থেকেই ভারতবর্ষ গণিত বিদ্যাকে জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে নিতে পেরেছিল।

গণিতকে ব্যবহার করে সময়ের পরিমাপ বিষয়ে বেদ, ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত সমস্ত গ্রন্থেই বিস্তারিত আলোচনা আছে। শ্রীমদ্ভাগবতের ৩য় স্কন্ধের একাদশ অধ্যায়ে মৈত্রেয় মুনি শ্রীবিদুরকে এই তত্ত্ব ব্যাখ্যা করছিলেন, ''দুটি পরমাণু মিলে একটি অণু হয় আর তিনটি অণুর মিলনে হয় এক 'এসরেণু' হয়। তিনটি এসরেণুকে অতিক্রম করতে সূর্যরশ্মির যে সময় লাগে তাকে 'ত্রুটি' বলে। একশো ত্রুটিকে 'বেধ' বলা হয়, তিন বেধে এক 'লব', তিন লবে এক 'নিমেষ', তিন নিমেষে এক 'ক্ষণ', পাঁচ ক্ষণে এক 'কাষ্ঠা', পনেরো কাষ্ঠায় এক 'লঘু', পনেরো লঘুতে এক 'নাড়িকা' বা 'দণ্ড'। দুই নাড়িকায় এক 'মুহূর্ত' এবং দিনের হ্রস্বতা ও দীর্ঘতা অনুযায়ী ছয় বা সাত নাড়িকায় এক 'প্রহর' হয়।'' এইরূপ বিবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সময়ের একক প্রাচীন ভারতে প্রচলিত ছিল। তিনি আরও বলেন, ''চার প্রহরে এক দিন এবং চার প্রহরে এক রাত্রি হয়। পনেরো অহোরাত্রে এক 'পক্ষ' হয়। দুই পক্ষে এক মাস, দুই মাসে এক ঋতু, ছয় মাসে এক 'অয়ন' হয়। দুই অয়ন বা বারো মাসে হয় এক বছর।'' এরপর আরও দীর্ঘ সময়ের ধারণা দেন। ব্রিটিশ দার্শনিক অ্যালান ওয়াটস যথার্থই বলেছেন, ''the concept of light years is no matter for astonishment to people used to thinking of time in million of Kalpas.'' অর্থাৎ যারা লক্ষ লক্ষ কল্প নিয়ে ভাবতে অভ্যস্ত তাদের কাছে আলোকবর্ষের ধারণাটি বিস্ময়ের কোনো বিষয় নয়। সেই প্রাচীন ভারতীয় হিসাবেই অনেকটা আজও সময় পরিমাপ করা হয়।

প্রাচীন ভারতবর্ষের এই সমৃদ্ধি লক্ষ্য করে আমাদের শিক্ষা, জ্ঞানচর্চা, সংস্কৃতির প্রতি, আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে। যে বিদ্যা একদিন বিশ্বকে পথ চলতে শিখিয়েছিল, সারা পৃথিবীকে গুনতে শিখিয়েছিল, তার চর্চা করা বোধ হয় ভারতবাসী হিসেবে আমাদের কর্তব্য। আধুনিক বিজ্ঞানচর্চার পাশাপাশি, প্রাচীন ভারতীয় গণিত ও বিজ্ঞানের গবেষণা হলে ভারতের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধিত হতে পারে বলে মনে হয়।

(লেখক যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী প্রযুক্তিবিদ)

হিন্দুশূন্য করতে বাংলাদেশে 'বিএনপি' আবারও ক্ষমতায় আসর জন্য ষড়যন্ত্র করছে

সেন্টু রঞ্জন চক্রবর্তী

অর্ধ শতাব্দী অতিক্রান্ত হলো। অনেক প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশকে সে দেশের একটা বিশাল অংশ এখনো মন থেকে মেনে নিতে পারছে না। প্রতিক্রিয়াশীল এই গোষ্ঠীর বর্তমান নাম বিএনপি-জামাত। তারা পশ্চিম পাকিস্তানের পেটে জন্মগ্রহণকারী পিতৃপরিচয়হীন সহোদর। স্বাধীনতা সংগ্রামে তারা বিরোধিতা করেছে। তাদের বর্তমান উপাধি রাজাকার। এই রাজাকার যখনই সময় পেয়েছে তখনই হিন্দুদের ক্ষতি করার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে কালবিলম্ব করেনি। অনেকটা গিরগিটির মতোই তাদের চরিত্র। এই নিবন্ধে আমি কিছু ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা তুলে ধরেছি। দেখুন, কেমন হিংস্র তারা। তারা আবার ক্ষমতায় আসতে চাইছে। বিশ্ব বিবেকের কাছে এ তথ্য প্রামাণিক দলিল হয়ে থাকবে এ আমার বিশ্বাস।

১৯৭০-এর নির্বাচনের আগে ও পরে এই রাজাকারদের নির্বাচনী স্লোগান ছিল 'জয় বাংলা, জয় হিন্দ, লুঙ্গি রাইখা ধুতি পিন্দ'। সে নির্বাচনে তাদের ভরাডুবি হয়েছিল। দেশ স্বাধীন হলো। অকৃত্রিম বন্ধু দেশ ভারত সে দেশের স্বাধীনতা অর্জনের পথ সুগাম করার জন্য বিশ্ব জনমত তৈরি করেছিল। ভারত অনেক ত্যাগ স্বীকার করেও, অনেক দিয়েও প্রতিবেশী বন্ধুর মন পায়নি। ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার মধ্য দিয়ে বেইমানরা নতুন নীল নকশা ধরে হিন্দু নিধন এবং হিন্দুশূন্য মোল্লাবাদী আতঙ্কের দেশ গঠনের কাজ শুরু করে। ফলে নীরবে অঘটন ঘটতে শুরু হলো। ১৯৯২ সালে ভারতে বাবরি ধাঁচা অপসারণকে কেন্দ্র করে হিন্দুদের উপর নেমে আসে নির্যাতনের খড়্গ। সেই সময়ে ৩৫২টি হিন্দু মন্দির আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। তার পাশাপাশি হিন্দুদের পরিবারের মহিলাদের নির্বিচারে ধর্ষণ ও লুটতরাজের হাজার হাজার ঘটনা ঘটে। সে ঘটনাসমূহ নানাভাবে ধামাচাপা দেওয়া হয়েছিল। বিএনপি ক্ষমতায় এসেই বাবরি ধাঁচা ভাঙার ধুয়া তুলে ২৮ দিন ধরে সারাদেশে হিন্দুদের উপর নারকীয় নির্যাতন চালায়। ২০১২ থেকে ২০১৪ সালে নির্বাচনের আগে পর্যন্ত মোল্লাবাদী জামাতের সঙ্গে জোটবেঁধে হিন্দুদের উপর হামলা চালায়।

২০০১ সালের নির্বাচনে বিএনপি স্লোগান তোলে, 'হিন্দু যদি বাঁচতে চাও বাংলা ছেড়ে চলে যাও'। তারা আরও অপপ্রচার করে যে আওয়ামি লিগ ক্ষমতায় এলে মসজিদে উলুধ্বনি শোনা যাবে। এগুলি ছিল সাধারণ মানুষকে ভারতের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার জন্য উসকানি। তখন এই আতঙ্কবাদী দলটি আওয়ামি লিগ-সহ হিন্দুদের বিরুদ্ধে ২৮০০০ সহিংস ঘটনা ঘটায়। এর মধ্যে হত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, নারী ধর্ষণ, জমি দখল বাড়ি দখল ও উচ্ছেদ। সে সময়ে হিন্দুদের দোকানপাট, উপাসনালয়-সহ যা কিছু আছে হিন্দুরা সেসব হারাতে শুরু করলো। হিন্দুরা হয়ে উঠল অসহায়। এই সকল অমানবিক নির্যাতনের প্রতিবাদে তৎকালীন আওয়ামি লিগ সংসদ সদস্য তোফায়েল আহমদ এবং সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত জাতীয় সংসদে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। তখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল মতিন সংসদে বিষয়টিকে হাসি ঠাট্টার মতো জবাব দিয়ে মহান সংসদকে কালিমালিপ্ত, কলুষিত ও কলঙ্কিত করেন। একই সময়ে হিন্দুদের ধর্মান্তরণের কাজ ও তারা করতে শুরু করে এবং প্রকাশ্যে গোরুর মাংস খেতে তাদের বাধ্য করতে শুরু করেছিল।

ভোলা জেলার চরফেশানে এক রাতে দুইশো হিন্দু মহিলাকে গণধর্ষণ করে ঐতিহাসিক নারকীয়তার নজির গড়েছিল। নারকীয়তার বীভৎসতা এতই নির্মম ছিল যে শিশুদের সামনে এক বিছানায় কুকুরের মতো মা ও মেয়েকে বলাৎকার করতেও তারা এতটুকু ভাবেনি। একই বছরে অক্টোবরের নির্বাচনের পর বরিশালের গৌরনদীর আগৈলঝরার হাজার হাজার হিন্দু নির্যাতিত হয়ে কোটালীপাড়ায় আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হয়েছিল, সেটি আজ আর কারোই অজানা নয়। মেহেরপুরে খ্রিস্টানদের চার্চে হামলা চালিয়ে ভগবান যিশুর ছবি ভাঙচুর, সম্পত্তি লুণ্ঠন ও সারা দেশে হিন্দুদের স্থাপনা ভাঙচুর করেই ক্ষান্ত না হয়ে দেব-দেবীদের মূর্তিও তারা গুড়িয়ে দেয়।

জেহাদি সন্ত্রাসীরা সে বছরের ১ অক্টোবর গৌরনদীতে পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বা সাবিত্রী দাসকে স্বামীর সামনেই গণধর্ষণ করেছিল।



ভোলার লালমোহনের আট বছরে বয়সি মেয়ে রীতা রানি দাসকে পালাক্রমে ওই হায়েনার দল ধর্ষণ করে।

সিরাজগঞ্জের উলটোপাড়ার ১৬ বছরের পূর্ণিমা শীলকে মায়ের হাত থেকে জোর করে তুলে নিয়ে নারকীয় কায়দায় ধর্ষণ করে। সাহসী পূর্ণিমা সে ঘটনা ঢাকায় সাংবাদিক সম্মেলন করে জাতির কাছে বিচার চেয়েছিল। পরবর্তীতে হায়েনারা তাকে তুলে নিয়ে গেলে আজও তার সন্ধান মিলেনি। আজও তার পরিবার জানে না তার ভাগ্যে কী ঘটেছে। সে বছরের ১৬ নভেম্বর বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রিন্সিপ্যাল গোপালকৃষ্ণ মুহুরীকে বিএনপি সন্ত্রাসীরা তার নিজের বাসায় সকালবেলা চায়ের টেবিলে গুলি করে মাথার খুলি উড়িয়ে হত্যা করে।

২০০২ সালের ২১ এপ্রিল রাউজান উপজেলার অনাথ আশ্রমের বৌদ্ধ ভিক্ষু জ্ঞানজ্যোতি মহাথেরোকে জবাই করে হত্যা করে। ২৯ এপ্রিল পার্বত্য জেলা খাগড়াছড়ির মানিকছড়ির হিন্দু পুরোহিত মদন গোপাল গোস্বামীকে ছাত্রদলের নেতারা গভীর রাতে নিজ বাড়িতে নৃশংস ভাবে হত্যা করে। সে মাসেই নাটোরের লালপুর উপজেলায় গোঁসাইয়েরহাট এলাকায় খুন হয়েছিল সুমন সাহা নামে আরও এক প্রতিবাদী। সেই বছরের ২১ আগস্ট বাগেরহাট রামপাল উপজেলায় আওয়ামি লিগ নেত্রী ছবি রানি মণ্ডলকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে বিএনপি অফিসে তার চুল কেটে, উলঙ্গ করে, হাতুড়ি দিয়ে মুখে বুকে এবং লজ্জাস্থানে আঘাতে রক্তাক্ত করে শরীরের ছবি তুলে রাস্তায় ফেলে রাখে। পথচারীরা সেদিন লজ্জা ও ভয়ে সে পথে চলাচল করেনি।

২০০৩ সালে ১৩ সেপ্টেম্বর পটুয়াখালীর কলাপাড়ার কুয়াকাটায় বৌদ্ধ বিহারের জমিতে বিএনপি পার্টি অফিস তৈরি করে। একই বছরের ১৮ নভেম্বর আওয়ামি লিগ নেতা মানব হিতৈষী ডাক্তার সুধীন্দ্রনাথকে হত্যা করা হয়েছিল। একই দিনে বাঁশখালী সাধনপুর গ্রামের শিলপাড়ার তেজেন্দ্র শীলের বাড়ির একই পরিবারের এগারো জনকে নির্মমভাবে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়। এ ঘটনাটি ঘটেছিল তৎকালীন বন ও পরিবেশ মন্ত্রী জাফরুল ইসলাম চৌধুরীর চাচাতো ভাই আমিনুর রহমানের নেতৃত্বে।

২০০৫ সালে ২৫ অক্টোবর কক্সবাজারের বাহারছড়ায় রাখাইনদের পাহাড় ও বৌদ্ধমন্দিরের জায়গায় নিহত হন পুরোহিত মিংকই রাখাইন। এই ঘটনাগুলি পাঠ করে যে কোনো লোক আঁতকে উঠবেন। আরও হাজারো ঘটনা আছে যেগুলি মনুষ্যত্ব বিবর্জিত। যারা এ সকল ঘটনার সাক্ষী তারা আরও অনেক বেশি করে বলতে পারবেন। আমি শুধু মনে করিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব পালন করলাম। এই লোমহর্ষক ঘটনার নায়কেরা আবারও সংঘটিত হয়ে অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার পরিকল্পনা করছে। স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছে, মানুষ হত্যা করে উল্লাস করেছে। তারা নারী ধর্ষণ করে আয়েস মিটিয়েছে। হিন্দুদের জমি জিরান, সম্পদ শিল্প ব্যবসা বাণিজ্য কুক্ষিগত করেছে। তাদের খুশি করার জন্য আবারও জেহাদি শক্তির মহড়া শুরুর পরিকল্পনা হচ্ছে। হিন্দুরাই কেন তাদের টার্গেট?

বিশ্ব বিবেক তাদের যে কোনো বিচারে বর্জন করবে সেটাই সত্য। আমার ধারণা, তাদের ক্ষমতায় আসা বাস্তবিকভাবে দিবাস্বপ্ন ছাড়া আর কিছু নয়। বাংলাদেশ আপন গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। এ ধারাবাহিকতা অটুট রাখা আজকের বাংলাদেশের মানুষের পাশাপাশি শান্তিপ্রিয় ভ্রাতৃপ্রতিম প্রতিবেশী দেশেরও কর্তব্য। □



২০০১ সালের নির্বাচনের পর বরিশালের বিভিন্ন এলাকা থেকে বিতাড়িত, নির্যাতিতরা রাশীল আশ্রম কেন্দ্রে ঠাঁই নিয়েছিল (ফাইল চিত্র)।

বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে ?

একবার সমস্ত ইঁদুর একটি সভায় মিলিত হলো। আলোচনার বিষয় ছিল কী করে বেড়ালের হাত থেকে বাঁচা যায়। কারণ বেড়ালের জ্বালায় তারা সবাই অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। তাই নিয়ে তাদের এদিনের আলোচনা সভা।



সেখানে সবাই নানা পরামর্শ দিতে লাগল। যার যা মনে আসে তাই বলতে লাগল। কিন্তু কোনো প্রস্তাবই ঠিকমতো কারও মনে ধরছে না। শেষকালে কম বয়সি এক বুদ্ধিমান ইঁদুর উঠে দাঁড়াল। সে বলল— এতক্ষণ তো অনেকে অনেক কথাই বললেন। এবার আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে, তা আপনাদের বলি। একটু ধৈর্য ধরে শুনুন।

সকলে সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল— হ্যাঁ হ্যাঁ শুনি শুনি। তখন সেই বুদ্ধিমান ইঁদুর কোনো ভনিতা না করেই বলতে শুরু করল— বেড়ালের গলায় একটা ঘণ্টা বেঁধে দেওয়া হোক। ঘণ্টার শব্দ শুনলেই বুঝতে পারা যাবে বেড়াল আসছে। তাহলেই আমরা সাবধান হয়ে যেতে পারব। বেড়াল আর আমাদের কাউকে ধরে খেতে পারবে না।

তার প্রস্তাব শুনে সবাই ধন্য ধন্য করতে লাগল। হ্যাঁ, বুদ্ধিমানের মতোই একটা বটে। একদম ঠিক। একথা তো আগে কারও মাথায় অসেনি। সবাই প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

প্রথম থেকেই এক বৃদ্ধ বেড়াল এক কোণে চুপ করে বসে ছিল। সবাই একটু শান্ত হয়ে যেতেই সে বলল— ভাই সব, একটা কথা আমার আমার মনে হচ্ছে। এতক্ষণ পর্যন্ত ওই উৎসাহী ছোকরা ইঁদুর যে কথা বলল, তা খুবই বুদ্ধির কথা বটে। এটা ঠিক যে এরকম করতে পারলেই আমাদের সমস্যার সমাধান হয়ে যেতে পারে। আর বেশি চিন্তার কিছু নেই, তবে.....

এই পর্যন্ত শুনে ওই কমবয়সি বুদ্ধিমান ইঁদুর বুক ফুলিয়ে বলে উঠল— তাহলে আবার তবে কেন? ওই কাজটাই করতে হবে।

তখন আবার ওই বৃদ্ধ ইঁদুরটি উঠে দাঁড়াল, বলল, তবে এটাও চিন্তার কথা যে আমাদের মধ্যে কে এই দায়িত্ব নেবে? মানে আমি এটাই জানতে চাই যে বেড়ালের গলায় ঘণ্টাটি কে বাঁধতে যাবে? কারও এত সাহস আছে কি?

এই কথা শুনে সভাস্থ সকল ইঁদুরের মুখ শুকিয়ে গেল। যে বুদ্ধিমান ইঁদুরটি এতক্ষণ বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়েছিল সে এবার মাথা নীচু করে বসে পড়ল। তার মানে বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধার সাহস এখানে কারও নেই।

এমন সময় কাছেই একবার ম্যাঁও শব্দ হতেই ইঁদুরের সভা একেবারে ফাঁকা।

অর্থাৎ কোনো বিষয়ের প্রস্তাব করা খুব সহজ, কিন্তু তা বাস্তবে করে দেখানো অত সহজ নয়।

সংগৃহীত

বীর বনবাসী

তাঁতিয়া ভীল



জনজাতি স্বাধীনতা সংগ্রামী তাঁতিয়া ভীলের মধ্যপ্রদেশের খণ্ডোয়া জেলার পনধানা তহসিলের বড়দা গ্রামে ১৮৪২ সালের ২৬ জানুয়ারি জন্ম হয়। তিনি ১৮৭৮ থেকে ১৮৮৯ সাল একজন সক্রিয় যোদ্ধা ছিলেন। ইংরেজদের কাছে তিনি ভারতীয় রবিন হুড নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি গেরিলা যুদ্ধে নিপুণ ছিলেন। ইংরেজদের ধনসম্পদ লুট করে গরিব দুঃখীদের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন। ১৮৮৮ সালে এক বিশ্বাসঘাতক তাঁকে ইংরেজের হাতে ধরিয়ে দেয়। বিচারে তাঁর প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। ১৮৮৯ সালের ৪ ডিসেম্বর ফাঁসি হয়।

জানো কি?

- মধু বছরের পর বছর রেখে দিলেও পচে যায় না।
- কাচ মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ১০ লক্ষ বছর সময় লাগে।
- ব্যাং জলে থেকেও জল পান করে না।
- মানুষ তার জীবনের ২৫ বছর ঘুমিয়ে কাটায়।
- মোবাইল ফোনকে বাংলায় চলভাষ বলা হয়।
- ২৪ ঘণ্টা পার হলেই খবরের কাগজ পুরনো হয়ে যায়।
- মৃত্যুর পর মানুষের কিডনি ৭২ ঘণ্টা, লিভার ৮ থেকে ১২ ঘণ্টা, চোখের কর্নিয়া প্রায় ৬ ঘণ্টা বেঁচে থাকে।

ভালো কথা

আমার পুরী ভ্রমণ

গত বছর বাবা-মা'র সঙ্গে বাসে করে পুরী গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে প্রথম সমুদ্র দেখেছিলাম। তারপর নন্দনকানন, কোনারক মন্দির, খণ্ডগিরি, উদয়গিরি, ধবলগিরি, লিঙ্গরাজ মন্দির, গৌড়ীয়মঠ, গুণ্ডিচা মন্দির, চন্দনপুষ্করিণী দেখেছিলাম। সমুদ্রের উঁচু উঁচু ঢেউ দেখতে খুব ভালো লাগছিল। সন্ধ্যেবেলা সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়েছিলাম। একটার পর একটা ঢেউ এসে পা ধুইয়ে দিচ্ছিল। পুরীর খাজা বিখ্যাত। আমরা খাজা, জামাকাপড় আর কিছু মূর্তি কিনেছিলাম। আমরা উটেও চেপেছিলাম। সমুদ্রের জলে কয়েকটা মাছ ভেসে এসেছিল। দাদা ভুট্টা খেয়েছিল,আমি মোমো আর ঝালমুড়ি খেয়েছিলাম।

ঐশী হালদার, প্রথম শ্রেণী, গোপালনগর, শ্রীপল্লী, পূর্ব বর্ধমান।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

হাঁস

ঐন্দ্রি মহান্ত, দ্বিতীয় শ্রেণী, নুড়াইপানা, সিউড়ি, বীরভূম।

সাতসকালে প্যাঁক প্যাঁক প্যাঁক
হাঁসগুলি সব চলে
একটাতো নয় দলে দলে
চলছে খালে বিলে।

আনন্দেতে পাল্লা দিয়ে
দিচ্ছে জলে ডুব
গুগলি শামুক ধরছে ঠোঁটে
মজায় আছে খুব।

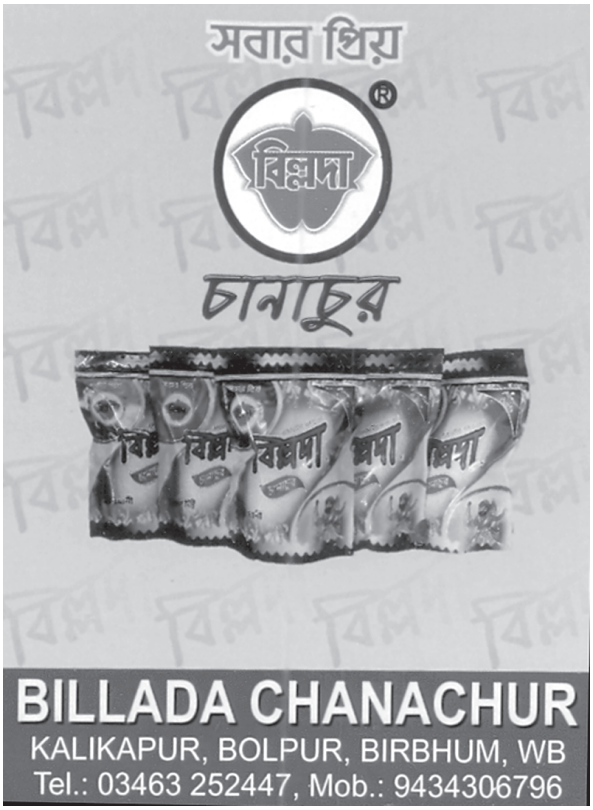
লেখা পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

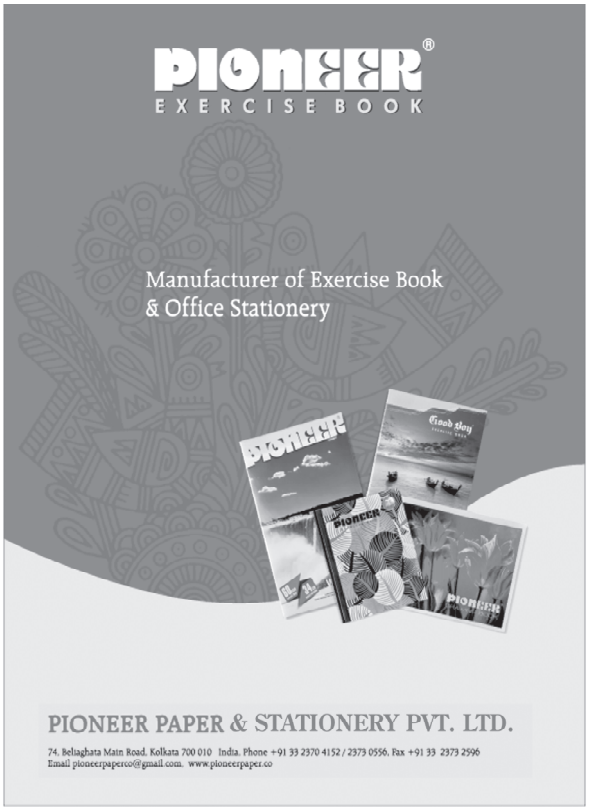
নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা ই-মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)





যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের
ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

রাজ্যজুড়ে সংস্কার ভারতীর অমৃত মহোৎসব সমাপন সমারোহ

স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব উপলক্ষ্যে সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত জেলায় জেলায় পক্ষকালব্যাপী ভারতমাতা এবং স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রাণ বলিদানকারী ভারতমাতার বীর সন্তানদের প্রতি কলা সাধনার মাধ্যমে শ্রদ্ধাঞ্জলি **অমৃত তর্পণ** অনুষ্ঠান সুচারুরূপে সম্পন্ন হলো। এই কার্যক্রমে দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের কার্যকর্তাগণ জেলায় জেলায় বিভিন্ন দিনে উপস্থিত ছিলেন।

৫ আগস্ট উত্তর কলকাতা জেলা বয়েজ ওন লাইব্রেরি হলে **প্রণমি তোমারে জন্মভূমি** নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে। উপস্থিত ছিলেন ড. স্বপন মুখোপাধ্যায়, সুভাষ ভট্টাচার্য, ভরত কুণ্ডু ও অমিত দে। ওইদিন উত্তর কলকাতা জেলার চারটি চর্চাকেন্দ্রে— উত্তর কলকাতা, বাগুইআটি, দেশবন্ধুনগর ও দক্ষিণেশ্বর— সংগীত, নৃত্য ও কবিতা পাঠের মধ্যে দিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানো হয়। শিশুশিল্পীদের নিবেদন কবিতা , গান এবং অমিত দের পরিচালনায় শ্রুতিনাটক **সুভাষচন্দ্রের চিঠি** প্রশংসার দাবি রাখে।

ওইদিনই উত্তর ২৪ পরগনা জেলা গোবরডাঙ্গা স্টেশন সংলগ্ন নিবেদিতা শিশুতীর্থের অনুষ্ঠান কক্ষে স্বাধীনতা যুদ্ধের নেপথ্যে থাকা যোদ্ধা কবি-সাহিত্যিক দীনবন্ধু মিত্রের অবদানকে কেন্দ্র করে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। অধ্যাপক ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ মজুমদার স্বাধীনতা আন্দোলনে দীনবন্ধু মিত্রের অবদানের কথা তুলে ধরেন। উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ অধিকারী গোপাল কুণ্ডু। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সহ সভানেত্রী সুতপা কর্মকার।

৬ আগস্ট রাসবিহারী এভিনিউ ত্রিকোণ পার্কের মহানির্বাণ মঠের নাটমন্দিরে দক্ষিণ কলকাতা জেলা সমিতি আয়োজিত অনুষ্ঠানে অমৃত তর্পণ পাঁচটি বিধা সহযোগে সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়। উপস্থিত ছিলেন প্রান্তের বিভাগ সংগঠন মন্ত্রী উদয় কুমার দাস, প্রদেশের অন্যতম সম্পাদিকা শ্রীমতী রীণা ব্যানার্জি, সাহিত্য বিধার সহ প্রমুখ অরিত্র ঘোষ দস্তিদার এবং উত্তর কলকাতা জেলার সম্পাদিকা শ্রীমতী মিতালি ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানে বিশেষ আকর্ষণ ছিল শিল্পী শীর্ষ আচার্যের তাৎক্ষণিক ভাস্কর্য নির্মাণ।

একই দিনে সিউড়ীর রবীন্দ্র মঞ্চে বীরভূম জেলা আয়োজিত অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। স্বাগত ভাষণ রাখেন জেলা সম্পাদক সুদীপ কুমার চট্টোপাধ্যায়। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড.স্বপন মুখোপাধ্যায়, কল্লোল ভট্টাচার্য, স্বপ্না চক্রবর্তী, অমিত অধিকারী এবং দুকড়িবালা দেবীর দুই নাতি অশোক কুমার চক্রাবর্তী ও পার্থপ্রতিম চক্রবর্তী। দুকড়িবালা দেবীকে স্মরণ করে **বীর ললনার বিজয়গাথা** নামে একটি গীতিআলেখ্য পরিবেশিত হয়। এরপর প্রদর্শিত হয় তথ্যচিত্র। তারপরে **নমামি ভারতবর্ষম্** শীর্ষক গীতিআলেখ্য।



১১ আগস্ট উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বনগাঁর নীলদর্পণ প্রেক্ষাগৃহে জেলার শিল্পীরা পরিবেশন করেন **স্বাধীনতার গল্পকথা**। উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের সাধারণ সম্পাদক তিলক সেনগুপ্ত। কেন্দ্রীয় কোষ টোলির সদস্য তথা প্রান্ত পরামর্শদাতা ভরত কুণ্ডু। বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ সুমন হীরা। জেলা সভানেত্রী শ্রীমতী শাশ্বতী নাথ। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয়ার্ধে ছিল গোবরডাঙ্গা চিরন্তন নাট্য সংস্থার দেশাত্মবোধক নাটক **সার্থক জনম আমার**। নৃত্যশিল্পী জয়ন্ত বিশ্বাস তাঁর শিষ্যদের নিয়ে নৃত্যভাবনা প্রদর্শন করেন। পরিবেশিত হয় জেলা সংগীত বিধা সংযোজিকার সফল পরিচালনায় দুটি

ফঃ ৬

গীতিআলেখ্য। শব্দ প্রক্ষেপণের সাহায্যে পরিবেশিত হয় **স্বাধীনতার গল্পকথা**। গোবরডাঙ্গা মুকুলিকা গানের স্কুলের ছাত্রীদের সুরেলা কণ্ঠ মন জয় করে দর্শকদের। বনগাঁ সুরাঙ্গন বেহালা কেন্দ্রের ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা পরিবেশিত হয় **বন্দেমাতরম্** এবং **ও আমার দেশের মাটি** গান। সুর ও ঝংকার নৃত্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের গুরু চৈতালি দাস এবং তাঁর শিষ্যদের দ্বারা পরিবেশিত হয় সংস্কার ভারতীর বহু প্রশংসিত নৃত্য নির্মিতি **ভারত আমার স্বদেশ আমার**। এই কেন্দ্রেরই শিশুশিল্পীরা পরিবেশন করে ভারত নাট্যম্ নৃত্যরীতির মাধ্যমে সংস্কার ভারতীর ভাবসংগীত। ধ্যানরতা বিশ্বাসের অনবদ্য ভাষ্য রচনা এবং সহ সম্পাদিকা শর্মিষ্ঠা সাধুখাঁর সাবলীল পাঠে ও সংস্কার ভারতীর সংগীত গোষ্ঠীর গানের মাধ্যমে পরিবেশিত গীতিআলেখ্য **জননী জন্মভূমি**।

এইদিনই পূর্ব বর্ধমান জেলা শাখা বাদামতলা বিবেকানন্দ শিশুমন্দির প্রাঙ্গণে তাদের উৎসব সুন্দরভাবে সম্পন্ন করে। অনুষ্ঠানের বিষয় ছিল এই **ভারতের মহামানবের সাগরতীরে**। প্রত্যেক সদস্য এক-একজন বিপ্লবীর জীবনচরিত তুলে ধরেন। উপস্থিত ছিলেন বিভাগ সংগঠন সম্পাদক উদয় কুমার দাস। এদিনই অনুষ্ঠান হয় ঝাড়গ্রাম জেলায়। উপস্থিত ছিলেন প্রান্ত সহসভাপতি সুভাষ ভট্টাচার্য। প্রান্ত সম্পাদক অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, প্রান্ত সমিতির সদস্য নিখিল সমাদ্দার। ভারতমাতার বন্দনা শুরু হয় স্থানীয় লোকনৃত্য পাতানাচ-গানের মাধ্যমে। এরপরে ছৌ নাচ এবং বন্দে মাতরম্ গানের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

মুম্বাইয়ে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা ‘জোনাকি’র উদ্বোধনী অনুষ্ঠান



গত ১৬ জুলাই মুম্বাই যোগেশ্বরী রামমন্দির সভাগৃহে বাংলা সাহিত্য পত্রিকা জোনাকি-র উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হলো। পত্রিকার মোড়ক উন্মোচন করেন মুম্বাই দুর্গাবাড়ি সমিতির সভানেত্রী শ্রীমতী সুস্মিতা মিত্র। উপস্থিত ছিলেন নিখিল বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের মুম্বাই শাখার সচিব শঙ্কর মৈত্র, আন্ধেরি সর্বজনীন কালীপূজা কমিটির অধিকর্তা কমল বসাক, গল্পকার ও নাট্যকার গোরা চক্রবর্তী এবং জোনাকির সম্পাদক, সহ সম্পাদক ও উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্যবৃন্দ। পত্রিকা উন্মোচনের পর শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। কবিতা পাঠ এবং ছোটোদের নাচ ও গানে অনুষ্ঠানটি সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে ওঠে।

অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মধুশ্রী হাতিয়াল।

১২ আগস্ট হুগলী জেলা সমিতির অনুষ্ঠান ব্যান্ডেল পূর্ব নলডাঙ্গার সেনগুপ্ত বাড়ির দুর্গামন্দিরে সম্পন্ন হয়। উপস্থিত ছিলেন বিভাগ সংগঠন সম্পাদক উদয় কুমার দাস, জেলা সহ সভাপতি নীহাররঞ্জন সেন। দেশাত্মবোধক সংগীত, নৃত্য, নৃত্যনাট্য ও যোগাসন পরিবেশিত হয়। ১৩ আগস্ট হাওড়া নগর আয়োজিত অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় শিবপুর পাবলিক লাইব্রেরি মঞ্চে। উপস্থিত ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্তা প্রবীর ঘোষাল, আইনজীবী দেবরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, শাখা, প্রদেশ এবং কেন্দ্রীয় সমিতির কার্যকর্তা রথীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, উদয় কুমার দাস, মহাশ্বেতা চক্রবর্তী ও ভরত কুণ্ডু। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন শুভঙ্কর ভট্টাচার্য। এদিনই বিষ্ণুপুর নগরে অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বিষ্ণুপুর নগর কার্যবাহ সন্দীপন চক্রবর্তী। শাস্ত্রীয় সংগীতের মাধ্যম শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন জেলার সদস্যরা। এদিন মুর্শিদাবাদ জেলার অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন বহরমপুর শহরে ডলি মণ্ডলের বাড়িতে। সেখানে অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন শ্রীমতী চিত্রা চৌধুরী। ১৫ আগস্ট অনুষ্ঠানের আয়োজন করে হাওড়া গ্রামীণ জেলা ও নদীয়া জেলা। হাওড়া জেলার অনুষ্ঠান হয় বাগনানে। উপস্থিত ছিলেন অ্যাডভোকেট ফটিক চক্রবর্তী। বিচারকের আসনে ছিলেন অধ্যাপক সৌমেন চক্রবর্তী। নদীয়া জেলার অনুষ্ঠান হয় নবদ্বীপের সুদর্শন মন্দিরে। উপস্থিত ছিলেন ড. অরুণ কুমার চক্রবর্তী। পতাকা উত্তোলন করেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের জেলা সভাপতি শ্রুতিশেখর গোস্বামী। উপস্থিত ছিলেন নদীয়া জেলার সকল সদস্য। কৃষ্ণনগর শাখা ও নবদ্বীপ শাখা একটি করে গীতিআলেখ্য পরিবেশন করে।

সংস্কার ভারতীর প্রান্ত সাধারণ সম্পাদক তিলক সেনগুপ্ত বলেন, স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসবের সমাপন সমারোহ অনুষ্ঠান অমৃত অর্পণ রাজ্যের ১৬টি জেলায় ১ থেকে ১৫ আগস্টের মধ্যে করে নজির গড়ল। পাশাপাশি এই ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বঙ্গ সংস্কৃতির বহুমুখী ধারার প্রকাশ ঘটালো।

বিবেকানন্দ বিদ্যাবিকাশ পরিষদের আন্তঃজেলা জ্ঞান বিজ্ঞান মেলা

গত ২৭ আগস্ট বিবেকানন্দ বিদ্যাবিকাশ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গের উদ্যোগে গোপালী শিশুমন্দিরে পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম জেলার ৯টি সংকুলের ভাই-বোনেদের মিলিত আন্তঃজেলা জ্ঞান বিজ্ঞান মেলা অনুষ্ঠিত হলো। ৯টি সংকুল থেকে তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রী, আচার্য-আচার্যা মিলে ২১৫ জন অংশগ্রহণ করেন। বিজ্ঞান মেলায় বৈদিক গণিত ও সংস্কৃতি জ্ঞান প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এছাড়া বিজ্ঞান প্রয়োগ, গণিত প্রয়োগ এবং বিজ্ঞানের মডেল প্রদর্শিত হয়। বিজ্ঞানের মডেলের মধ্যে পাঁচটি বিষয় ছিল— (১) সরল যন্ত্র, (২৩) পদার্থের বিভিন্ন অংশ, (৩) মানবদেহের অভ্যন্তরীণ তন্ত্র, (৪) যানবাহন ব্যবস্থা এবং (৫) উদ্ভাবনী। বিভিন্ন সংকুলের ভাই-বোনেরা সুন্দর ও তথ্যপূর্ণ মডেল এনেছিল এবং বিচারকদের সামনে তার ব্যাখ্যাও সুন্দর ও সাবলীলভাবে দিয়েছে।



বিচারকমণ্ডলীতে ১৮ জন ছিলেন। গোপালীর আশেপাশের বিভিন্ন হাইস্কুলের বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক এবং কয়েকজন প্রাক্তন ভাই-বোনও বিচারক হিসেবে ছিলেন। সমস্ত মডেল পরিদর্শন এবং বিজ্ঞান ও গণিত প্রয়োগ দেখে তাঁরা মান নির্ণয় করেন। শেষে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানে গোপালী হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতী অর্পিতা পড়িয়া দাস তাঁর বক্তব্যে বিদ্যাভারতী তথা শিশুমন্দিরের ভূয়সী প্রশংসা করেন। ছোটো ছোটো পড়ুয়ারা সুন্দরভাবে যে জ্ঞান বিজ্ঞানের মডেল উপস্থাপন করতে পারে তা তাঁর বক্তব্যে বারবার উঠে আসে। প্রাক্তন ছাত্র হলদিয়া ড. মেঘনাদ সাহা পলিটেকনিক কলেজের ইলেক্ট্রনিকের লেকচারার সোমশুভ্র ভঞ্জ তাঁর বক্তব্য রাখতে গিয়ে তাঁর পুরনোদিনের ছেড়ে যাওয়া শিশুমন্দিরের সেই বন্দনা, দীপ প্রজ্বলন, পুষ্পাঞ্জলি, রাষ্ট্রবন্দনা ইত্যাদির বারবার উল্লেখ করছিলেন। প্রাক্তনী হিসেবে এই অনুষ্ঠানে আসতে পেরে তিনি গর্ব অনুভব করছিলেন। রাষ্ট্রবন্দনার পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানের দায়িত্বে ছিলেন প্রধানাচার্য অবনী কুমার ভঞ্জ।

সক্ষম দক্ষিণবঙ্গ ও ইএসআই মেডিক্যাল কলেজের উদ্যোগে জাতীয় চক্ষুদান পক্ষ উদ্‌যাপন



সক্ষম দক্ষিণবঙ্গ এবং জোকা ইএসআই মেডিক্যাল কলেজের যৌথ উদ্যোগে গত ২৯ আগস্ট জাতীয় চক্ষুদান পক্ষ উপলক্ষ্যে জনসচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডিন প্রফেসর সঞ্জয় কেশকর, মেডিক্যাল সুপার ড. সোনালি মুখার্জি এবং অন্যান্য আধিকারিকরা। সক্ষমের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সংগঠন সম্পাদক চন্দ্রশেখরজী, প্রান্ত সভাপতি ডাঃ সনৎ কুমার রায়, প্রান্ত সম্পাদক অনিখ ব্যানার্জী। অধ্যাপক ডাঃ কেশকর প্রতিশ্রুতি দেন যে তিনি আগামীদিনে সক্ষমের সঙ্গে জনহিতকর কাজে সর্বপ্রকারের সহযোগিতা করবেন। চন্দ্রশেখরজী আশা প্রকাশ করেন, আগামীদিনে এখানেও চক্ষুব্যাংক স্থাপিত হবে। প্রিয়ংবদা বিড়লা আই ব্যাংকের দুজন প্রতিনিধিও উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত শ্রোতাদের অনেকেই চক্ষুদান অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষর করেন।

আলোচনা সভা পরিচালনা করেন ইএসআই হসপিটালের চক্ষু বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডাঃ অরুণাভ কুণ্ডু।

উত্তরের সংস্কার ভারতী রায়গঞ্জ চর্চাকেন্দ্রের উদ্যোগে বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান



উত্তরের সংস্কার ভারতী উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ চর্চাকেন্দ্রের উদ্যোগে গত ১৪ আগস্ট রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউট হলে বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী পরেশাত্মানন্দজী মহারাজ। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সঙ্ঘচালক হৃষীকেশ সাহা এবং কেন্দ্রীয় সঞ্চার ব্যুরো, রায়গঞ্জের ফিল্ড পাবলিসিটি অফিসার বিরাজ নারায়ণ রায়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উত্তরের সংস্কার ভারতী, উত্তরবঙ্গ প্রান্তের সভাপতি বিপ্লব দেব, সাধারণ সম্পাদক বিকাশ কুমার ভৌমিক, মাতৃশক্তি প্রমুখ শ্রীমতী শুক্লা অধিকারী।

গত ৬ ও ১৩ আগস্ট দুদিন ব্যাপী স্থানীয় ইংরেজি মাধ্যম সারদা বিদ্যামন্দিরে অঙ্কন, সংগীত, তবলা, লহরা, নৃত্য, আবৃত্তি এবং যোগাসন প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হয়। সমস্ত বিভাগ মিলিয়ে ৯২০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। প্রত্যেক প্রতিযোগীকে পুরস্কার হিসেবে সুদৃশ্য মেডেল দেওয়া হয়। ১৪ আগস্ট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মঞ্চে বিজয়ীদের হাতে তুলে দেওয়া হয় সুদৃশ্য মেমেন্টো ও শংসাপত্র। অনুষ্ঠানে সংস্কার ভারতীর শিল্পীরা নৃত্য, গান, আবৃত্তি পরিবেশন করেন। ৭০০ জন দর্শক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিরাজ নারায়ণ রায়।

সংস্কার বিষয়ক বক্তব্য রাখেন হৃষীকেশ সাহা এবং স্বামী পরেশাত্মানন্দজী মহারাজ। উল্লেখ্য,অনুষ্ঠানের আংশিক আর্থিক ব্যয় বহন করে ভারত সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রক। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন শ্রীমতী সুতপা মিশ্র, শ্রীমতী শুক্লা অধিকারী ও গৌতম রায়। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বিকাশ কুমার ভৌমিক।

কামারপুকুর-জয়রামবাটিতে লোকপ্রজ্ঞার অনুভব দর্শনের দ্বিতীয় পর্ব



অখিল ভারতীয় প্রবুদ্ধ মঞ্চ প্রজ্ঞাপ্রবাহের পশ্চিমবঙ্গ শাখা লোকপ্রজ্ঞার উদ্যোগে ও ব্যবস্থাপনায় পুণ্যভূমি কামারপুকুর- জয়রামবাটিতে গত ২৬,২৭ আগস্ট অনুষ্ঠিত হলো অনুভব দর্শন অনুষ্ঠান। রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে ১৫০ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন অনুষ্ঠানে। সকলের থাকা ও প্রসাদের ব্যবস্থা কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মঠের ভক্তনিবাসেই ছিল। প্রথমদিন পায়ে হেঁটে ঠাকুরের জন্মস্থান, পাঠশালা এবং ঠাকুর-মা-স্বামীজীর পদধূলিধন্য স্থানগুলিতে পরিভ্রমণ করা হয়। দ্বিতীয়দিনে ২৫টি গাড়িতে শ্রীমা সারদাদেবীর পুণ্য জন্মস্থান জয়রামবাটি এবং পাশাপাশি ২০টি স্থান পরিভ্রমণের পর শ্রীশ্রী ঠাকুরের পাঠশালায় শুরু হয় সমবেত অনুষ্ঠান। লোকপ্রজ্ঞা ছাত্রশক্তির ছাত্র-ছাত্রীরা স্বদেশমন্ত্র, গান, কবিতা পরিবেশন করেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বসুবিজ্ঞান মন্দিরের ডিরেক্টর ড. উদয় বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্নালিজম ও মাসকমিউনিকেশন বিভাগের ড. বিপ্লব লোহ চৌধুরী, সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকার পূর্বতন সম্পাদক ড. বিজয় আঢ্য, বর্তমান সম্পাদক ড. তিলকরঞ্জন বেরা, জয়রামবাটি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সন্ন্যাসী স্বামী পররূপানন্দজী মহারাজ, কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী অবধূতানন্দজী মহারাজ এবং প্রজ্ঞাপ্রবাহের পূর্বক্ষেত্রের সংযোজক অরবিন্দ দাশ।

কালিম্পঙে ভারত উদয় সোসাইটির উদ্যোগে রক্ষাবন্ধন উৎসব

গত ৩১ আগস্ট কালিম্পং শহরের মারওয়ার প্যালেসে কালিম্পং ভারত উদয় সোসাইটির পক্ষ থেকে রক্ষাবন্ধন উৎসব ও জেলা স্তরীয় ধর্মরক্ষা পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কালিম্পং জেলার সামাজিক ও আধ্যাত্মিক সংস্থার অগ্রগণ্য চন্দ্রলোক মিলন ক্লাবকে এবছরের ধর্মরক্ষা পুরস্কার প্রদান করা হয়। সভাপতি ও সহ সভানেত্রীর আসন অলংকৃত করেন যথাক্রমে অম্বিকা প্রসাদ শর্মা ও শ্রীমতী লীলা লেপচা। প্রধান অতিথি ছিলেন অ্যাডভোকেট প্রভাকর দেওয়ান। মুখ্য বক্তা ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্রের সহক্ষেত্র প্রচারক জলধর মাহাত। এছাড়াও ছিলেন কালিম্পং ব্লক ১ পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান



শ্রীমতী মমতা গুরুং, মঙ্গলধামের পূজারি গগনজী মহারাজ, লেপচা সমাজের প্রতিনিধি তেনশেরিং লেপচা, সভাসদ পালদেন তামাং, হরিজন সমাজের প্রতিনিধি গোবিন্দ বসোরে, অবসরপ্রাপ্ত ডিএসপি এল বি কুমাই, প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক দয়া ঘিসিং, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সহ সঙ্ঘচালক তথা গিতদুবলিং উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক চোতেনদুপ লেপচা, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কর্মকর্তা লোকরাজ আগরওয়াল, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সহ প্রান্ত প্রচার প্রমুখ তথা ভারত উদয়ের সভাপতি সমীর কুমার ঘোষ, কল্যাণ আশ্রমের অখিল ভারতীয় কর্মকর্তা ফুলশেরিং লেপচা, অখিল ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের কর্মকর্তা ভানুথাপা মানগর, ব্রহ্মকুমারী প্রজাপিতার দেওরাজ প্রধান, নেপালি সংস্কৃতি পরিষদের কার্যকরী অধ্যক্ষ অশোক চৌরাসিয়া, একতা সমাজের অধ্যক্ষ বিরালু কোঠী এবং নেপালি সংস্কৃতি পরিষদের রাজেন শিবকোঠী।

শ্রদ্ধার শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন অনুষ্ঠান



গত ২৭ আগস্ট শ্রদ্ধার ১৪০ তম শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয় সিউড়ীর লালদিঘিপাড়া নিবাসী শ্রীমত্যা পারুলবালা দাসকে। অনুষ্ঠানের সূচনা করেন শ্রদ্ধার সম্পাদক দামোদর ঘোষাল। প্রদীপ প্রজ্বলন করেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সন্ন্যাসী স্বামী বরদানন্দ মহারাজ। শ্রীমত্যা দাসকে মাল্যদানে ভূষিত করেন রুপালি ঘোষাল। মায়ের পা ধুইয়ে পূজা করেন তাঁর কন্যা মানবী সরকার। নামাবলী, বস্ত্র, গীতা, ফল ও মিষ্টান্ন দেওয়া হয় মায়ের হাতে। মানপত্র পাঠ করেন প্রাক্তন পোস্টাল সুপারিনটেনডেন্ট আগমানন্দ মুখোপাধ্যায়। শ্রদ্ধার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। সংগীত পরিবেশন করেন অসীমা মুখোপাধ্যায়, অলোকা গাঙ্গুলি, সুব্রত নন্দন, কাকলি দাস ও সোমদত্তা সরকার। পঞ্চপ্রদীপে আরতি করেন কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায়, সুজাতা বিষ্ণু ও সুচিত্রা ঘোষাল। অধ্যাপিকা চৈতালি মিশ্র কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। শান্তিমন্ত্র পাঠ করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন সংগঠন সম্পাদক লক্ষ্মণ বিষ্ণু। সমগ্র অনুষ্ঠান সুচারু রূপে সঞ্চালনা করেন বেণীমাধব উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও সাংবাদিক পতিতপাবন বৈরাগ্য।

মালদহের গাজোলে দুর্গাবাহিনীর সম্মেলন

গত ১৭ আগস্ট বিশ্ব হিন্দু পরিষদ মালদহ বিভাগের দুর্গাবাহিনীর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় গাজোল সরস্বতী শিশু মন্দিরে। উপস্থিত ছিলেন দুর্গাবাহিনীর অখিল ভারতীয় সংযোজিকা শ্রীমতী প্রজ্ঞা মহল্যা, কোচবিহার বিভাগ দুর্গাবাহিনীর সংযোজিকা রত্না কিসকু। সম্মেলনে ৮০ জন সদস্যা অংশগ্রহণ করেন।



কাশ্মীরি নেতাকে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ২০১৮ সালে জম্মু-কাশ্মীর বিধানসভায় দাঁড়িয়ে ন্যাশনাল কনফারেন্স বিধায়ক মহম্মদ আকবর লোন পাকিস্তান জিন্দাবাদ স্লোগান দিয়েছিলেন। ২০১৯ সালে সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদকে নিষ্প্রভাবী ঘোষণা করার মাধ্যমে তৎকালীন জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের স্পেশাল স্ট্যাটাসের পরিসমাপ্তি ঘটে। কেন্দ্রীয় সরকারের সেই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে দায়ের করা মামলায় অন্যতম আবেদনকারী আকবর লোন। কেন্দ্রীয় সরকার পক্ষের আইনজীবী সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা এই মামলার শুনানিতে অংশ নিয়ে সর্বোচ্চ আদালতকে ২০১৮ সালের এই ঘটনার বিষয়ে জানান। এই মর্মে আকবর লোনের তরফে ক্ষমা প্রার্থনা এবং ভারতীয় সংবিধানের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের দাবি জানান সলিসিটর জেনারেল। গত ১ সেপ্টেম্বর কাশ্মীরি পণ্ডিতদের একটি গোষ্ঠীর তরফে লোনের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন



তুলে তাকে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির সমর্থক বলে উল্লেখ করা হয়। প্রসঙ্গত, ২০০২ থেকে ২০১৮ অব্দি লোন জম্মু-কাশ্মীর বিধানসভার সদস্য ছিলেন। এই বিধানসভার সদস্যরা জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের নিজস্ব সংবিধান মেনে ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষার শপথ নিতেন। ১৯৫৭ সালে এই রাজ্যের সংবিধান প্রণীত হয়, ২০১৯ সালে আগস্টে ভারতের রাষ্ট্রপতির নির্দেশে তা নিষ্প্রভাবী ঘোষিত হয়। ২০১৯ সালে আকবর লোন লোকসভার সাংসদ নির্বাচিত হন। তাঁর পক্ষে আইনজীবী কপিল সিবাল প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বে ৫ জন বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চকে এই প্রসঙ্গে জানান যে আকবর লোন বর্তমানে একজন সাংসদ, তিনি ভারতের একজন নাগরিক এবং ভারতীয় সংবিধানের দ্বারা তাঁর পদে শপথ নিয়েছেন। তিনি ভারতের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করেন। এই জবাবে সন্তুষ্ট না হয়ে সুপ্রিম কোর্ট ভারতীয় সংবিধানের প্রতি আনুগত্যের অঙ্গীকার ও ভারতের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে এই কাশ্মীরি নেতাকে এফিডেভিট দায়ের করার নির্দেশ দেন।

প্রাণনাশের আশঙ্কায় অসমের মহিলা চিকিৎসক

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ তিনি আগে মুসলমান ছিলেন, এখন তিনি হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেছেন। পেশায় তিনি একজন চিকিৎসক। কিন্তু এই তরুণী হিন্দুধর্ম গ্রহণ করার পর থেকেই তাকে নানাভাবে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। তার দাবি, হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেছেন বলেই তার জীবন এখন ঝুঁকির মুখে পড়ে গেছে। এমনকী প্রাণে বাঁচতে তিনি একটি বিমানবন্দরে আশ্রয় নিয়েছেন।

এই ঘটনায় তার পাশে দাঁড়িয়ে প্রয়োজনীয় তদন্ত করে দেখার নির্দেশ দিয়েছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। বিশ্বশর্মা জানিয়েছেন, তদন্ত করে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে। হেনস্থার শিকার ওই চিকিৎসকের নাম আলিমা আখতার। তার বাড়ি ডিব্রুগড় জেলায়।

ওই চিকিৎসকের বক্তব্যের একটি ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। সেখানে তাঁকে বলতে শোনা গেছে, তিনি নিজের ইচ্ছেতেই হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেছেন। আর তারপর থেকেই তার পরিবার ও জামাতের তরফে নানা রকম হুমকি পাচ্ছেন তিনি। ভিডিয়োটিতে চিকিৎসক দাবি করেছেন, তার পরিবার একজন কট্টরবাদীর সঙ্গে তার বিয়ে দেওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছে। চিকিৎসক বলেছেন এখনই তার কোনোভাবেই বিয়ে করার ইচ্ছে নেই। তিনি বলছেন, 'নিজের ইচ্ছেতেই আমি হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেছি। তারপর থেকে আমার পরিবারের সদস্যরা আমাকে নানাভাবে হুমকি দিচ্ছে। আমাকে ভয় দেখানো হচ্ছে। আমার বিরুদ্ধে নানারকম মিথ্যা অভিযোগ করা হচ্ছে। আমাকে অপহরণ করা হয়েছে বলে দাবি করে থানায় মিথ্যে মামলা করা হয়েছে যাতে পুলিশ আমাকে তাদের হাতে সহজেই তুলে দেয়।'

তিনি জানান, প্রাণভয়ে তিনি একটি বিমানবন্দরে আশ্রয় নিয়েছেন। সেখানে তিনি সুস্থ আছেন। চিকিৎসক বলেছেন এক মৌলানার সঙ্গে জোর করে তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে তার পরিবার। ওই মৌলানা তার থেকে বয়সে অনেকটাই বড়ো। এইসব কারণেই তিনি পরিবারের থেকে নিজে দূরত্ব তৈরি করেছেন। পরিবারের ধারণা মৌলানার সঙ্গে বিয়ে দিলে তবেই জন্নাত লাভ করবে। ওই চিকিৎসক ডিব্রুগড় অসম মেডিক্যাল কলেজের সঙ্গে যুক্ত। তিনি জানান, তিনি তার জীবন নিয়ে যথেষ্ট খুশি এবং শান্তিতে থাকতে তিনি পরিবারের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখতে চান।



স্বস্তিকার ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে। সংরক্ষণযোগ্য এই গ্রন্থটি স্বস্তিকায় এযাবৎ প্রকাশিত বিশিষ্ট লেখকদের নির্বাচিত রচনার সংকলন। যেমন— রমেশচন্দ্র মজুমদার, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, কু সী সুদর্শন, মোহনরাও ভাগবত, দত্তোপন্ত ঠেংড়ী, এইচ ভি শেষাদ্রি, নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত, সীতানাথ গোস্বামী, অসীম কুমার মিত্র, ভবেন্দু ভট্টাচার্য, কালিদাস বসু, দেবানন্দ ব্রহ্মচারী, পবিত্র কুমার ঘোষ, রমানাথ রায়, অমলেশ মিশ্র, রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী, তথাগত রায়, অচিন্ত্য বিশ্বাস, জিষ্ণু বসু, শিবপ্রসাদ রায়, ধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবর্তী, দীনেশ সিংহ, প্রণব চট্টোপাধ্যায়, স্বরূপ প্রসাদ ঘোষ প্রমুখ বিশিষ্ট লেখকের লেখায় সমৃদ্ধ।

এটি আগামী ৩ অক্টোবর '২৩ পরমপূজনীয় সরসঙ্ঘচালক শ্রীমোহনরাও ভাগবতের করকমল দ্বারা বেলুড় মঠের প্রেক্ষাগৃহে প্রকাশিত হবে।

গ্রন্থটির মূল্য ধার্য করা হয়েছে ৪০০ টাকা।
প্রকাশ পূর্ব মূল্য ৩০০ টাকা।

যোগাযোগ—

শ্রী তপন সাহা — ৯৯০৩০০২৯০১
শ্রী মহিম দাস — ৯৪৭৭৩৯৯২৯৭
শ্রী জয়রাম মণ্ডল — ৮৬৯৭৭৩৫২১৪/২১৫

স্বস্তিকা

পূজা সংখ্যা : ১৪৩০

মহালয়ার আগেই প্রকাশিত হবে

পরিবারের সবাই মিলে পড়ার মতো পত্রিকা

১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্টের পরপর কয়েকটি দিনের কথা মনে পড়লে এখনও গা শিউরে ওঠে। উত্তর ও মধ্য কলকাতার পথঘাট ভেসে গিয়েছিল নিরীহ হিন্দুদের রক্তে। সেই সময় হিন্দুদের পরিত্রাতা রূপে যিনি পথে নেমেছিলেন, তাঁর নাম গোপাল মুখার্জি। পারিবারিক সূত্রে পাঁঠার মাংসের দোকান ছিল বলে লোকে তাঁর পদবির জায়গায় 'পাঠা' বলত। সেই অদম্য সাহসী হিন্দু রক্ষাকারী মানুষটির জীবনের উপর আলোকপাত করেছেন **নারায়ণ চক্রবর্তী** তাঁর লেখায়— **ইতিহাসের উপেক্ষিত নায়ক।**

বর্তমান ভারতে 'হিন্দুত্ব' শব্দটি বহুচর্চিত। সেই সূত্রে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রসঙ্গটিও। আর এই 'হিন্দুত্ব' শব্দটি গ্রন্থের শিরোনাম হিসেবে সর্বপ্রথম যিনি বিদ্বজ্জন সমাজে তুলে ধরেন সেই চন্দ্রনাথ বসুর জীবন ও সমাজ ভাবনা নিয়ে লেখা--- **'হিন্দুত্ব : চন্দ্রনাথ বসু ও আর এস এস'। লিখেছেন— বিজয় আঢ্য।**

সভ্যতার ঊষাকাল থেকেই শুভ-অশুভ , দেব অসুরের দ্বন্দ্ব চিরন্তন। নানান রূপে আজও প্রবহমান। মাতৃপূজার এই শুভ লগ্নে অসুরদলনী দেবী দুর্গার সেই অতুলনীয় বৈচিত্র্যময় এক রূপের কাহিনি ফুটিয়ে তুলেছেন **প্রবাল** তাঁর লেখা— **'অথ ত্রিলিঙ্গ কথা...'** য়।

প্রখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী বীর সাভারকরকে গান্ধীহত্যার ঘটনায় যুক্ত করার চক্রান্তের দিক উন্মোচন করেছেন বিশিষ্ট লেখক, গবেষক ও সাংবাদিক **সুজিত রায়** তাঁর রচনা— **নাথুরামের বিচার ঃ এক অন্তহীন কোর্টরুম ড্রামা'য়।**

আরও যাঁরা লিখেছেন—

দেবী প্রসঙ্গ

ড. জয়ন্ত কুশারী

উপন্যাস

এষা দে, শেখর সেনগুপ্ত

পুরাণ কথা

নন্দলাল ভট্টাচার্য

গল্প

সিদ্ধার্থ সিংহ, সন্দীপ চক্রবর্তী, অনির্বাণ দে, দেবদাস কুণ্ডু, সমাজ বসু, জয়ন্ত পাল।

প্রবন্ধ

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্র জোশী, ড. রাজলক্ষ্মী বসু, গোপাল চক্রবর্তী , ড. পঙ্কজ কুমার রায়

আপনার কপি আজই বুক করুন।। দাম : ৭০.০০ টাকা